কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

আরবী অভিধানে مكر শব্দের অর্থ হল কোন ছল-কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের লোককে তার উদ্দেশ্য সাধনে বিরত রাখা। বস্তুত এ কাজ যদি কোন সদুদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা উত্তম ও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অসৎ মতলবে করা হলে দূষণীয় এবং মন্দ কাজ। কাজেই এ শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমনসব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা কিংবা তুলনার মাধ্যমে দূষণীয় ছলনার কোন অবকাশ থাকতে না পারে। যেমনটি এখানে হয়েছে।---(মাযহারী)

এখানে এ কথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতের শেষাংশে যেসব শব্দ বলা হয়েছে তা বর্তমান-ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ অর্থাৎ তারা ঈমানদারদেরকে কষ্টদানের জন্য কলা-কৌশল করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ তাদের সে কলা-কৌশলকে ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে থাকবেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা-তদ্‌বীর করাটা কাফিরদের চিরাচরিত বৃত্তি থাকবে। আর তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহায়তাও সর্বকালেই সত্যিকার মুসলমানদের উপর থেকে তাদের সেসব ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিতে থাকবে।

একত্রিশ ও বত্রিশতম আয়াতে সেই 'দারুন-নদ্‌ওয়ার' জনৈক সদস্য নযর ইবনে হারিসের এক অহেতুক সংলাপ এবং ত্রিশতম আয়াতে তার জওয়াব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নযর ইবনে হারিস ব্যবসায়ী লোক ছিল এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে ইহুদী-নাসারাদের গ্রন্থ ও তাদের ইবাদত-উপাসনা বার বার দেখার সুযোগ পেয়েছিল। কাজেই সে যখন কোরআনে করীমে বিগত উম্মতসমূহের অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ শুনল তখন বলল ঃ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ অর্থাৎ "এসব তো আমাদের শোনা কথাই। আমরা ইচ্ছা করলে এমন কথা বলতে পারি। এগুলো তো বিগত লোকদেরই ইতিকথা" তারপর কোন কোন সাহাবী যখন তাকে লা-জওয়াব করে দিলেন যে, যদি বলতেই পার. তবে বলছ না কেন? কোরআন যে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধান করে

দিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জও করে দিয়েছে যে, এর বিরোধীরা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কোরআনের ছোট একটি সূরার অনুরূপই একটি সূরা উপস্থাপন করে দেখাক। অথচ বিরোধিতায় যারা জানের বাজি লাগিয়েছিল, যারা ধন-দৌলত আর সন্তান-সন্ততিকে পর্যন্ত কুরবান করেছিল তাদের সবাই মিলে কোরআনের মুকাবিলায় ছোট একটি সূরাও পেশ করতে পারেনি। তাহলে এ কথা বলা যে, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে আমরাও এমন কালাম বলতে পারি,---এমন একটি কথা যা লাজ-লজ্জার অধিকারী কোন লোকই বলতে পারে না। তারপর নযর ইবনে হারিসের সামনে সাহাবায়ে কিরাম এই কালামের সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, তখন সে স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদের উপর তার দৃঢ়তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ অর্থাৎ হে আল্লাহ্, এই কোরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন আযাব নাযিল করে দিন।

স্বয়ং কোরআন করীম এর উত্তর দিয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা), আপনার মক্কায় থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না। কারণ, সমস্ত নবী-রসূলগণের ব্যাপারেই আল্লাহ্র নীতি এই যে, তাঁরা যে জনপদে থাকেন তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আযাব নাযিল করেন না, যতক্ষণ না স্বীয় পয়গম্বরদের সেখান থেকে সরিয়ে নেন। যেমন হযরত হূদ (আ), হযরত সালেহ (আ)ও হযরত লূত (আ)-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যতক্ষণ তাঁরা নিজেদের জনপদে অবস্থান করছিলেন, আযাব আসেনি। কিন্তু যখন তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে গেছেন, তখনই আযাব এসেছে। বিশেষ করে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া, যাঁকে সমগ্র বিশ্ব-চরাচরের জন্য রহমত নামে অভিহিত করা হয়েছে, তাঁর কোন জনপদে অবস্থান করা সত্ত্বেও সেখানকার অধিবাসীদের উপর আযাব আসা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী।

এ উত্তরের সারমর্ম এই যে, তোমরা তো কোরআন ও ইসলামের বিরোধিতার কারণে পাথর বর্ষণেরই যোগ্য, কিন্তু মহানবী (সা)-র মক্কায় অবস্থান এর অন্তরায়। ইমাম ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতের এ অংশটি সে সময় নাযিল হয়েছিল, যখন হুযূর (সা) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তারপর মদীনায় হিজরত করার পর

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয়। وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না, যখন তারা এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর মর্ম এই যে, মহানবী (সা)-র মদীনা চলে যাবার পর যদিও ব্যাপক আযাবের পথে যে অন্তরায় ছিল তা দূর হয়ে গেছে, অর্থাৎ তাঁর সেখানে বর্তমান থাকা, কিন্তু তারপরেও আযাব আসার পথে আরেকটি বাধা রয়ে গেছে তা হলো এই যে, অনেক দুর্বল মুসলমান যারা হিজরত করতে পারছিলেন না, সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে এস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরই খাতিরে মক্কাবাসীদের উপর আযাব নাযিল করা হয়নি।

অতপর এ সমস্ত মুসলমানও হিজরত করে যখন মদীনায় পৌঁছে যান, তারপরে আয়াতের এই বাক্যটি নাযিল হয়ঃ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব দেবেন না তা কেমন করে হয়, অর্থাৎ তারা রসূলকে মসজিদে হারামে গিয়ে ইবাদত করতে বাধা দান করে।

অর্থাৎ আযাব আসার পথের দু'টি অন্তরায়ই এখন দূর হয়ে গেছে। এখন মক্কাতে না আছেন মহানবী (সা), না আছেন ক্ষমা প্রার্থনাকারী মুসলমানগণ। অতএব আযাব আসতে এখন আর কোন বাধাই অবশিষ্ট নেই। বিশেষত তাদের শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা ছাড়াও আরেকটি অপরাধ সংযোজিত হয়েছে যে, তারা নিজেরা তো ইবাদত-উপাসনার যোগ্য ছিলই না, তদুপরি যেসব মুসলমান ইবাদত, ওমরা ও তওয়াফের উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে আসতে চায়, তাদেরকেও বাধাদান করতে শুরু করেছে। অতএব, এখন তাদের শাস্তি প্রাপ্তির বিষয়টি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে; সুতরাং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের উপর আযাব নাযিল করা হয়।

মসজিদে হারামে ঢোকার পথে বাধাদানের ঘটনাটি ঘটেছিল গযওয়ায়ে হোদায়বিয়ার সময় যখন মহানবী (সা) সাহাবায়ে-কিরামকে সঙ্গে নিয়ে ওমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল এবং হুযূরকে ও সঙ্গী সাহাবায়ে-কিরামকে ইহ্‌রাম খুলে ফেলতে এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। ঘটনাটি ৬ষ্ঠ হিজরী সালের। এরই দু'বছর পর হিজরী অষ্টম সালে মক্কা বিজয় হয়ে যায়। আর এভাবেই তাদের উপর মুসলমানদের হাতে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব নাযিল হয়।

এ আয়াতে যে তফসীর ইবনে জরীর (র) করেছেন, তা মহানবী (সা)-র মক্কায় অবস্থানকে আযাব না আসার কারণ বলে সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল। কোন

কোন মুফাসসির বলেছেন, মহানবী (সা)-র এ পৃথিবীর বুকে বর্তমান থাকাটাই আযাবের পথে অন্তরায় ছিল। যে পর্যন্ত তিনি দুনিয়ায় বর্তমান থাকবেন, তাঁর জাতির উপর আযাব আসতে পারে না। আর তার হেতু একান্তই স্পষ্ট যে, তাঁর অবস্থা অন্যান্য নবী-রসূলের মত নয়। কারণ, তাঁরা অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ বিশেষ বিশেষ স্থান, জনপদ, জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কাজেই সেখান থেকে বেরিয়ে যখন তাঁরা অন্য কোন এলাকায় চলে যেতেন, তখনই তাঁদের জাতি বা উম্মতের উপর আযাব চলে আসত। পক্ষান্তরে সাইয়্যেদুল-আম্বিয়া (সা)-এর নবুয়ত ও রিসালত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বিস্তৃত। সারা বিশ্ব তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের আওতাভুক্ত। সুতরাং যতক্ষণ তিনি দুনিয়ার বুকে যে কোন অংশে বর্তমান থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কওমের উপর আযাব আসতে পারে না।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মর্ম হবে এই যে, মক্কাবাসীদের কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে তাদের উপর পাথর বর্ষণই উচিত, কিন্তু দু'টি বিষয় এ আযাবের অন্তরায় হয়। প্রথমত মহানবী (সা)-র পৃথিবীতে আগমন এবং দ্বিতীয়ত মক্কাবাসীদের এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রর্থনা। কারণ, তারা কাফির হওয়া সত্ত্বেও কা'বার তওয়াফ প্রভৃতি অনুষ্ঠানকালে غفرانك غفرانك বলত এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত। তাদের এই এস্তেগফার কুফরী ও শেরেকীর দরুন আখিরাতে লাভজনক না হলেও পার্থিব জীবনে এতটুকু লাভ তারা অর্জন করেছে যে, দুনিয়াতে আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা কারো কোন আমল বিনষ্ট করে দেন না। কাফির ও মুশরিকরা যদি নেক আমল করে, তবে তার প্রতিদান ইহজগতেই তাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়।

তারপরের বাক্য যে, "এমনটি কেমন করে হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আযাব দান করবেন না, অথচ তারা মুসলমানদের মসজিদে হারামে গিয়ে ইবাদত করতে বাধা দান করে। এর মর্ম এ ক্ষেত্রে এই হবে যে, পার্থিব জীবনে তাদের উপর আযাব না আসায় তাদের গর্বিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়া উচিত নয় যে, আমরা অপরাধী নই, কিংবা আমাদের উপর আদৌ আযাব হবে না। দুনিয়াতে না হলেও আখিরাতের আযাব থেকে তাদের কোন ক্রমেই অব্যাহতি নেই। এই ব্যাখ্যা মতে مَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ বাক্যে আযাব বলতে আখিরাতের আযাবকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। প্রথমত এই যে, যে জনপদে লোকেরা এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, তাতে আযাব নাযিল করেন না।

দ্বিতীয়ত রসূলের বর্তমানে তাঁর উম্মতের উপর তা তারা মুসলমান হোক কিংবা কাফির—আযাব আসবে না। অর্থাৎ এমন ব্যাপক কোন আযাব নাযিল হবে না, যাতে গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যেমনটি ঘটেছিল নূহ, লূত ও শো'আয়েব (আ)

প্রমুখ নবীর উম্মতগণের সাথে যে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটে গেছে। তবে কোন ব্যক্তি বা নির্ধারিত কিছুর উপর আযাব আসাটা এর পরিপন্থী নয়। যেমন স্বয়ং রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন যে, আমার উম্মতে 'খসফ' ও 'মসখ'-এর, আযাব আসবে। 'খসফ' অর্থ মাটিতে পুঁতে যাওয়া। আর 'মসখ' অর্থ আকৃতি বিকৃত হয়ে বানর কিংবা শূকরে পরিণত হয়ে যাওয়া। এর মর্ম হল এই যে, উম্মতের কোন কোন লোকের উপর এমন আযাব আসবে।

আর মহানবী (সা) পৃথিবীতে অবস্থান বা বর্তমান থাকা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কারণ, তাঁর রিসালত কিয়ামত পর্যন্ত সময়েরই জন্য। তাছাড়া মহানবী (সা) এখনও জীবিত রয়েছেন, যদিও এই জীবনের প্রকৃতি পরবর্তী জীবন থেকে ভিন্নতর। যা হোক, এতদুভয় জীবনের পার্থক্যের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এর উপর না উম্মতের কোন ধর্মীয় কিংবা পার্থিব কাজ নির্ভর করছে, আর না স্বয়ং রসূলে করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম এহেন নিষ্প্রয়োজন আলোচনা পছন্দ করতেন বরং এসব বিতর্ক থেকে বারণ করতেন।

সারকথা, হুযূর (সা)-এর স্বীয় রওযায় জীবিত থাকা এবং তাঁর রিসালত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকাটাই এর প্রমাণ যে, কিয়ামত পর্যন্ত তিনি দুনিয়াতে অবস্থান করছেন। আর সে কারণেই এই উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا
مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ
الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا
فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

إِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

(৩৪) আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব দান করবেন না! অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়। (৩৫) আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। অতএব এবার নিজেদের কৃত কুফরীর আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৬) নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহ্র পথে। বস্তুত এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফির, তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৩৭) যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ্ অপবিত্র না পাককে পবিত্র পাক থেকে। আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তূপে পরিণত করেন এবং পরে দোযখে নিক্ষেপ করেন। এরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। (৩৮) তুমি বলে দাও কাফিরদেরকে যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতার দরুন অস্বাভাবিক রকমের কোন আযাব না আসার কারণে সম্পূর্ণভাবেই আযাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। কারণ, উল্লিখিত বিষয়গুলো যেসব আযাবের প্রতিবন্ধক তেমনি তাদের আচার-আচরণগুলো আযাবের উপযোগী বটে। সুতরাং প্রতিবন্ধকসমূহের কার্যকারিতা অস্বাভাবিক আযাবের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে, আর আযাবের উপযোগিতার প্রতিক্রিয়া পরবর্তীতে প্রকাশ পাবে। তাদের উপর অস্বাভাবিক আযাব নাযিল হবে। অতএব, উপযোগিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে,) তাদের কি যোগ্যতা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদেরকে (একেবারে সাধারণ) শাস্তিটুকুও না দেন? অথচ (তাদের এ সমস্ত আচার-আচরণ সবই শাস্তিযোগ্য। যেমন,) তারা [রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম তথা মুসলমানদের] মসজিদে-হারামে (যেতে; সেখানে নামায পড়তে এবং তার তওয়াফ করতে) বাধাদান করে। (যেমন, বাস্তব বাধাদান করেছে হোদায়বিয়ার সময়, যার ইতিবৃত্তান্ত সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। আর মক্কায় অবস্থানকালে পরিস্থিতিগতভাবে বাধাদান করেছে। এমন জ্বালাতন করেছে যে, শেষ পর্যন্ত স্বদেশ ত্যাগ করে হিজরত করার প্রয়োজন পড়েছে)।

অথচ তারা এই মসজিদের মুতাওয়াল্লী (হওয়ারও যোগ্য) নয়। (তাছাড়া ইবাদত-কারীদের বাধা দেয়া তো দূরের কথা, সে অধিকার তো মুতাওয়াল্লীদেরও নেই।) এর মুতাওয়াল্লী (হওয়ার যোগ্য) তো মুত্তাকীদের ছাড়া (যারা ঈমানদার) আর কেউই নয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (নিজেদের অযোগ্যতা সম্পর্কেও) জ্ঞান রাখে না। (জ্ঞান না থাকা কিংবা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার উপর আমল না করা অজ্ঞতারই অনু-রূপ। যাহোক, যথার্থই যারা নামাযী ছিলেন তাদেরকে তো মসজিদ থেকে এভাবে বাধা দিয়েছে।) আর (নিজেরা যে মসজিদের হক কতটা আদায় করেছে এবং তাতে কি উত্তম নামাযটি পড়েছে, তার বর্ণনা এই যে,) খানায়ে কা'বা (অর্থাৎ উল্লিখিত মস-জিদে হারাম)-এর নিকট তাদের নামায শুধুমাত্র শিস দেওয়া ও তালি বাজানই ছিল। (অর্থাৎ নামাযের পরিবর্তে সেখানে তাদের এ সমস্ত মূর্খজনোচিত আচার-অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হত।) অতএব (তাদের এহেন কার্যকলাপের আবশ্যিক দাবি হলো তাদের উপর কোন না কোন আযাব আসা। সাধারণ ও স্বাভাবিক হলেও তা নাযিল করে তাদেরকে বলে দেয়া যে,) এবার নিজেদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ কর (যার একটির প্রতিক্রিয়া হল لَوْ نَشَآءُ-বাক্যে এবং আরেকটি প্রতিক্রিয়া إِنْ كَانَ هٰذَا-বাক্যে, আরেক প্রতিক্রিয়া يَصُدُّوْنَ-এর কাজ আরেক প্রতিক্রিয়া مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً-এর কাজ। সুতরাং বিভিন্ন যুদ্ধে এই শাস্তি অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেমন এই সূরার দ্বিতীয় রুকূতে ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ الخ বলা হয়েছে ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ الخ এর পরে। আয়াতের এ পর্যন্ত তো ছিল তাদের কথা ও দৈহিক কাজকর্মের আলোচনা, তারপরে আসছে তাদের আর্থ-কর্মের বিবরণ। বলা হচ্ছে---) নিঃসন্দেহে এই কাফিররা নিজেদের অর্থ-সম্পদ এজন্য ব্যয় করে চলছে, যাতে আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ দীন) থেকে (মানুষকে) বাধাদান করতে পারে। [বস্তুত হুযূরে-আকরাম (সা)-এর বিরুদ্ধে মুকা-বিলা করার জন্য এবং তাঁর বিরোধিতাকল্পে সেসব উপকরণ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় করা হতো তার উদ্দেশ্যও যে তাই ছিল, তা বলাই বাহুল্য।] অতএব, এরা তো নিজেদের অর্থ-সম্পদ (এই উদ্দেশ্যেই) ব্যয় করতে থাকবে (কিন্তু) তারপর যখন অকৃতকার্যতার লক্ষণ অনুভূত হবে, তখন (ব্যয়কৃত) সে সম্পদ তাদের পক্ষে আক্ষেপ ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (ভাববে বৃথাই এ সম্পদ ব্যয় করলাম। আর) তারপর (শেষ পর্যন্ত যখন) ব্যর্থ হয়ে পড়বে। (তখন সম্পদের বৃথা ব্যয়ের অনুতাপের সঙ্গে পরাজয় ও ব্যর্থতার দ্বিতীয় অনুতাপটি একত্রিত হবে)। আর (তাদের এই শাস্তি অনুতাপ ও ব্যর্থতার গ্লানি তো হলো পার্থিবজীবনের জন্য। তদুপরি আখি-রাতের শাস্তি তো আলাদা। যার বর্ণনা এই যে,) কাফিরদের দোযখের দিকে (নিয়ে যাবার জন্য কিয়ামতের দিন) সমবেত করা হবে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা অপবিত্র

নাপাক (লোকদেরকে) পূতঃ পবিত্র (লোকদের) থেকে পৃথক করে দেন। (কারণ, দোযখীদের যখন দোযখের দিকে নিয়ে আসা হবে, তখন বাহ্যতই জান্নাতবাসীরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে) এবং (যাতে তাদের থেকে পৃথক করার পর) না-পাকদের পরস্পর মিলিয়ে (এবং) তারপর একত্র করে (নিয়ে) সবাইকে জাহান্নামে নিপতিত করেন। এ সমস্ত লোকই হল পরিপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত [যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি এসব কাফিরকে বলে দিন, যদি এরা (নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত হয়ে যায়, (এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়,) তবে তাদের সমস্ত পাপ যা (তাদের ইসলাম গ্রহণের) পূর্বে হয়েছে, সেসবই ক্ষমা করে দেয়া হবে। (এ হলো মুসলমান হওয়ার অবস্থার হুকুম।) পক্ষান্তরে যদি তারা নিজেদের সেই (কুফরী) অভ্যাস-আচরণই বজায় রাখে, তাহলে (তাদেরকে জানিয়ে দিন যে,) সাবেক কাফিরদের ব্যাপারে (আমার) আইন প্রবর্তিত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ পার্থিব জীবনে ধ্বংস আর পরকালে যে আযাব, তাই তোমাদের জন্যও হবে। সুতরাং হত্যার মাধ্যমেও ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছে। আর আরব কাফির ব্যতীত অন্যান্য কাফিরের যিম্মী হওয়াকেও ধ্বংসই মনে করবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরীর ও অস্বীকৃতির দরুন যদিও আসমানী আযাব প্রাপ্তিরই যোগ্য, কিন্তু মক্কায় রসূলে করীম (সা)-এর উপস্থিতি ব্যাপক আযাবের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। আর তাঁর হিজরতের পর সে সমস্ত অসহায় দুর্বল মুসলমানের কারণে এমন আযাব আসছে না যারা মক্কায় থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, রসূলে করীম (সা) কিংবা অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আযাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা আযাবের যোগ্যই নয়। বরং তাদের আযাবের যোগ্য হওয়াটা পরিষ্কার। তাছাড়া কুফরী ও অস্বীকৃতি ছাড়াও তাদের এমনসব অপরাধ রয়েছে যার ফলে তাদের উপর আযাব নেমে আসা উচিত। আলোচ্য আয়াত দু'টিতে তাদের তিনটি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত এরা নিজেরা তো মসজিদে-হারাম অর্থাৎ খানায়ে-কা'বায় ইবাদত করার যোগ্য নয়, তদুপরি যেসব মুসলমান সেখানে ইবাদত-বন্দেগী ও নামায, তাওয়াফ প্রভৃতি আদায় করতে চায়, তাদেরকে আগমনে বাধাদান করে। এতে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে যখন রসূলে করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামসহ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে বাধাদান করেছিল এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় অপরাধ হল এই যে, এই নির্বোধের দল মনে করত এবং বলত যে, আমরা মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী, যাকে ইচ্ছা এখানে আসতে অনুমতি দেব, যাকে ইচ্ছা দেব না।

তাদের এই ধারণা ছিল দু'টি ভুল বোঝাবুঝির ফলশ্রুতি। প্রথমত এই যে, তারা নিজেদের মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী বলে মনে করেছিল, অথচ কোন কাফির কোন মসজিদের মোতাওয়াল্লী হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তাদের এই ধারণা যে, যাকে ইচ্ছা তারা মসজিদে আসতে বাধাদান করতে পারে। অথচ মসজিদ যেহেতু আল্লাহ্‌র ঘর, সুতরাং এতে আসতে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। তবে এমন বিশেষ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যাতে মসজিদের অবমাননা কিংবা অন্য নামাযীদের কষ্টের আশংকা থাকে। যেমন, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন---"নিজেদের মসজিদসমূহকে রক্ষা কর ছোট শিশুদের থেকে, পাগলদের থেকে এবং নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ থেকে।" ছোট শিশু বলতে সেসব শিশুকে উদ্দেশ করা হয়েছে, যাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর পাগলদের দ্বারা অপবিত্রতারও আশংকা থাকে এবং নামাযীদের কষ্টেরও আশংকা থাকে। এছাড়া দিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের দরুন মসজিদের অসম্মানও হয় এবং নামাযীদের কষ্টও হয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে মসজিদের একজন মোতাওয়াল্লীর এমন শিশু ও পাগলদেরকে মসজিদে আসতে না দেয়ার এবং মসজিদে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ হতে না দেয়ার অধিকার থাকলেও এমন অবস্থা বা পরিস্থিতি ব্যতীত কোন মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দেবার কোন অধিকার নেই।

কোরআন করীমে আলোচ্য আয়াতটিতে শুধু প্রথম বিষয়টিরই আলোচনা করা হয়েছে যে, মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী যখন শুধুমাত্র মুত্তাকী পরহিযগার ব্যক্তিই হতে পারেন, তখন তাদেরকে কেমন করে এর মোতাওয়াল্লী হিসাবে স্বীকার করা যায়! এতে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মোতাওয়াল্লী কোন মুসলমান দীনদার ও পরহিযগার ব্যক্তিরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন মুফাসসেরীন إِنْ أَوْلِيَاءُهُ এর সর্বনামটি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত বলে সাব্যস্ত করে এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র ওলী শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহিযগার ব্যক্তিরাই হতে পারেন।

এই তফসীর বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যারা শরীয়ত ও সুন্নতের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ওলী হওয়ার দাবি করে, তারা সর্বৈব মিথ্যাবাদী এবং যারা এহেন লোকদের ওলীআল্লাহ্‌ বলে মনে করে, তারা (একান্তভাবেই) ধোঁকায় পতিত।

তাদের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাদের মধ্যে কুফর ও শিরকের পঙ্কিলতা তো ছিলই, তাদের কার্যকলাপও সাধারণ মানবিকতার স্তর থেকেও বহু নিম্নে রয়েছে।

কারণ, এরা নিজেদের যে কাজকে 'নামায' নামে অভিহিত করে, তা মুখে কিছু শিস দেয়া এবং হাতে কিছু তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। বলা বাহুল্য, যার সামান্যতম বুদ্ধিও থাকবে সেও এধরনের কার্যকলাপকে ইবাদত কিংবা নামায তো দূরের কথা, সঠিক কোন মানবীয় আচরণও বলতে পারে না। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ অর্থাৎ তোমাদের কুফরী ও অপরাধের পরিণতি এই যে, এবার আল্লাহ্‌র আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। আযাব বলতে এখানে আখিরাতের আযাব হতে পারে এবং পার্থিব আযাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মাধ্যমে তাদের উপর নাযিল হয়। এর পরে ৩৬ নং আয়াতে মক্কার কাফিরদের অন্য একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। যাতে তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অধিক মাল একত্র করেছিল এবং তা দীনে হক এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিন্ত করার জন্য তা ব্যয় করেছিলো কিন্তু পরিণতি এই দাঁড়িয়েছিলো যে, এ সম্পদও তাদের হাত থেকে চলে গেল এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল।

এ ঘটনার বিবরণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর বর্ণনা মতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে-বদরের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট আহত মক্কাবাসী কাফিররা যখন মক্কায় গিয়ে পৌঁছাল, তখন যাদের পিতা-পুত্র এযুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা বাণিজ্যিক কাফেলার আমীর আবূ সুফিয়ানের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আপনি তো জানেন, এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার হেফাযতকল্পে করা হয়েছে—যার ফলে জানমালের এহেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলমানদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। তারা এ দাবি মেনে নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে দেয় যা তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের অতিরিক্ত অনুতাপ যোগ হয়ে যায়।

কোরআন করীম এ আয়াতে এই ঘটনার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। বলা হয়, যারা কাফির, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র দীন থেকে মানুষকে বাধাদান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিজেদের ধন-সম্পদও ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুত গযওয়ায়ে-ওহুদে ঠিক তাই ঘটেছে; সঞ্চিত ধন-সম্পদও ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে।

বগভী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের ব্যয়সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। বদর যুদ্ধে এক হাজার জওয়ানের বাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলা করতে গিয়েছিল। তাদের খাবার-দাবার এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার বারজন সর্দার নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আবূ-জাহ্‌ল, ওৎবা, শায়বা প্রমুখ। . বলা বাহুল্য, এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানা-পিনা প্রভৃতিতে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কাজেই নিজেদের পরাজয়ের সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস হয়েছিল।---(মাযহারী)

আয়াত শেষে আখিরাতের দিক দিয়ে তাদের মন্দ পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ— وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ যারা কাফির, জাহান্নামের দিকেই হবে তাদের হাশর।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে, সত্য দীন থেকে বাধা দানকল্পে অর্থ ব্যয়ের যে অশুভ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, তাতে বর্তমান কালের সেসব কাফিরও অন্তর্ভুক্ত যারা মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে এবং নিজেদের মিথ্যা ও বাতিল মতবাদের প্রতি আহবান করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাসপাতালে, শিক্ষাঙ্গনে এবং দান-খয়রাতের নামে ব্যয় করে থাকে। তেমনিভাবে সেসব পথভ্রষ্ট ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলামের সর্ববাদীসম্মত আকীদা ও বিশ্বাসসমূহে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও সেগুলোর বিরুদ্ধে মানুষকে আহবান করার উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁর দীনের হেফাযত করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখাও যায় যে, এরা বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য থেকে যায়।

৩৭তম আয়াতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর কিছু ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে যার সার-সংক্ষেপ এই যে, কাফিররা যেসব সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং পরে যার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করেছে আর অপমানিত-অপদস্থ হয়েছে, তাতে ফায়দা হয়েছে এই ঃ لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাতে অপবিত্র পঙ্কিল এবং পবিত্র পূতঃ বস্তুতে পার্থক্য প্রকাশ করে দেন। طيب ও خبيث দু'টি বিপরীতার্থক শব্দ। خبيث শব্দটি অপবিত্র, গান্দা, পঙ্কিল ও হারাম বস্তুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর طيب তার বিপরীতে পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু বোঝাতে বলা হয়। এখানে এই দু'টি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে কাফিরদের অপবিত্র ধন-সম্পদ এবং মুসলমানদের পবিত্র সম্পদ ও অর্থ বোঝা যেতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে এই যে, কাফিররা যে বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে তা ছিল অপবিত্র—হারাম সম্পদ। ফলে তার অশুভ পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, তাতে মালও গেছে এবং জানও গেছে। পক্ষান্তরে তার বিপরীতে মুসলমানরা অতি অল্প পরিমাণ

সম্পদ ব্যয় করেছে, কিন্তু সে সম্পদ ছিল পবিত্র---হালাল। ফলে তা ব্যয়কারীরা বিজয় অর্জন করেছেন এবং সাথে সাথে গনীমতের মালামাল অর্জনেও সমর্থ হয়েছেন। তারপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার এক 'খবীস' তথা অপবিত্রকে অপর অপবিত্রের সাথে মিলিয়ে দেন এবং তারপর সে সমস্তকে সমবেত করে দেবেন জাহান্নামে। বস্তুত এরাই হল ক্ষতির সম্মুখীন।

অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, কাহরোবা যেমন ঘাসকে আকর্ষণ করে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাই পারস্পরিক আকর্ষণের উপর স্থাপিত, তেমনিভাবে কাজকর্ম, আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের মধ্যেও একটা আকর্ষণ রয়েছে। একটি মন্দ কাজ আরেকটি মন্দ কাজকে এবং একটি ভাল কাজ আরেকটি ভাল কাজকে আকর্ষণ করে। একটি খারাপ সম্পদ আরেকটি খারাপ সম্পদকে টেনে আনে এবং তারপর এসব খারাপ সম্পদ মিলে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর এরই পরিণতি হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত অপবিত্র সম্পদরাজিকে জাহান্নামে সমবেত করবেন এবং সম্পদের যারা অধিকারী তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

এছাড়া এখানে অনেক তফসীরবিদ মনীষী خبيث ও طيب -এর সাধারণ অর্থ অপবিত্র ও পবিত্র বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং 'পাক' বলতে 'মুমিন' আর অপবিত্র বলতে 'কাফির' বুঝিয়েছেন। এমতাবস্থায় মর্ম হবে এই যে, উল্লেখিত অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও অপবিত্র অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য করতে চান; সমস্ত মু'মিন জান্নাতে আর সমস্ত কাফির জাহান্নামে সমবেত হোক, এটাই তাঁর ইচ্ছা।

৩৮ তম আয়াতে কাফিরদের প্রতি আবারো এক মুরুব্বীসুলভ আহবান জানানো হয়েছে। এতে উৎসাহও রয়েছে এবং ভীতিও রয়েছে। উৎসাহ এ ব্যাপারে যে, যদি তারা এ সমুদয় কুকর্মের পরে এখনও তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তাহলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর ভীতি হলো এই যে, তারা যদি এখন অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাকে নতুন কোন আইন প্রণয়ন কিংবা নতুন করে কোন চিন্তাভাবনা করতে হবে না। বিগত কালের কাফিরদের জন্য যে আইন প্রবর্তিত হয়ে গেছে তাই তাদের উপরও প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং আখিরাতে হয়েছে কঠিন আযাবের যোগ্য।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ
انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

(৩৯) আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (৪০) আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (হে মুসলমানগণ, তাদের এই কাফির থাকা অবস্থায়) তোমরা তাদের সাথে (অর্থাৎ আরব কাফিরদের সাথে) ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তাদের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি (অর্থাৎ শিরকের ধারণা) শেষ হয়ে যায় এবং (আল্লাহ্‌র) দীন (নির্ভেজালভাবে যতক্ষণ না) আল্লাহ্‌র বলেই গণ্য হয়। (বস্তুত কারও ধর্মবিশ্বাস নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি স্থাপিত হওয়া ইসলাম কবুল করার উপরই নির্ভরশীল। কাজেই মর্ম দাঁড়ায় এই যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তারা ইসলাম কবুল করে নেয়। কারণ, আরবের কাফিরদের কাছ থেকে জিযিয়া কর নেয়া যায় না) অবশ্য এরা যদি (কুফরী থেকে) বিরত হয়ে যায়, তবে তাদের বাহ্যিক ইসলামকেই স্বীকার করে নাও, (মনের অবস্থার যাচাই করতে যেও না। কারণ, সাময়িকভাবে যদি তারা ঈমান না আনে তবে) তাদের কার্যকলাপগুলো আল্লাহ্ তা'আলা যথার্থভাবেই প্রত্যক্ষ করেন। (কাজেই তা তিনিই বোঝবেন, এতে আপনার কি এসে যায়?) আর যদি তারা (ইসলাম থেকে) বিমুখতা অবলম্বন করে, তবে (আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তাদের মুকাবিলা থেকে সরে এসো না আর) দৃঢ়বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের মুকাবিলায়) তোমাদের বন্ধু। তিনি অতি উত্তম বন্ধু বটেন এবং অতি উত্তম সাহায্যকারী। (কাজেই তিনি তোমাদের সাহায্য ও সহায়তা দান করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এটি হলো সূরা আনফালের উনচল্লিশতম আয়াত। এতে দু'টি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(১) ফেৎনা (২) দীন। আরবী অভিধান অনুযায়ী শব্দ দু'টি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তফসীর শাস্ত্রের ইমামগণ সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেঈনদের নিকট থেকে এখানে দু'টি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন। (১) ফেৎনা অর্থ কুফ্‌র ও শিরক আর (২) দীন অর্থ ইসলাম ধর্ম নিতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মুসলমানদের কাফিরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে, যতক্ষণ না কুফর নিঃশেষিত হয়ে ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব যতক্ষণ না বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এই নির্দেশ শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং আরববাসীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। কারণ, আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোন ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে দীন-ইসলামের জন্য তা হবে আশংকাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় দেয়া যেতে পারে। যেমন, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় তফসীর যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে তাহল এই যে, এতে 'ফেৎনা' অর্থ হচ্ছে সেসব দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার কাফিররা সদাসর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনার দিকে হিজরত করেন, তখন তারা প্রতিটি মুসলমানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের হত্যা ও লুণ্ঠন করতে থাকে। এমনকি মদীনায় পেঁছার পরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে 'দীন' শব্দের অর্থ হল প্রভাব ও বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, মুসলমানদের কাফিরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তাঁরা অন্যের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তাহল এই যে, মক্কার প্রশাসক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর বিরুদ্ধে যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সৈন্য সমাবেশ করে এবং উভয়পক্ষে মুসলমানদের উপরই যখন মুসলমানদের তলোয়ার চলতে থাকে, তখন দু'জন লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এখন মুসলমানগণ যে মহা-বিপদের সম্মুখীন, তা আপনি নিজেই দেখছেন। অথচ আপনি সেই উমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, তিনি কোনক্রমেই এহেন ফেৎনা-ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই আপনি আজকের ফেৎনার সমাধান করার উদ্দেশ্যে কি কারণে এগিয়ে আসেন না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মুসলমানের রক্তপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আগত দু'জন আরয করলেন,

আপনি কি কোরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন না لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى

অর্থাৎ যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনা-ফাসাদ তথা দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, নিশ্চয়ই আমি এ আয়াত পাঠ করি এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফেৎনা শেষ হয়ে দীন ইসলামের বিজয় সূচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কারো বিজয় সূচিত হোক, তা চাও না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জিহাদ ও যুদ্ধের হুকুম ছিল কুফুরীর ফেৎনা এবং কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। তা আমরা করেছি এবং বরাবরই করে যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফেৎনা প্রদমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়। বরং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই-বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-র হিদায়েত হচ্ছে এই যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ-জিহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ফেৎনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কিয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কিয়ামত পর্যন্তই জিহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ থাকবে।

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদের পরিণতিতে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত এই যে, তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করা থেকে বিরত হয়ে যাবে, তা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা নিজ নিজ ধর্মমতে থেকেই আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত এতদুভয় অবস্থার কোনটি গ্রহণ না করে অব্যাহত মুকাবিলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এই উভয় অবস্থার হুকুমই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ যথার্থ-ভাবেই অবলোকন করেন।

সে অনুযায়ীই তিনি তাদের সাথে ব্যবহার করবেন। সারমর্ম এই যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে

মুসলমানদের জন্য এমন আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের পর কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন কিংবা মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করাটা শুধুমাত্র যুদ্ধের চাল এবং ধোঁকাও হতে পারে। এমতাবস্থায় যুদ্ধবিরতি করা মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এরই উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা তো বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানেরই অনুবর্তী থাকবে। আর সে আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে জানেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কাজেই যখন তারা মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করবে এবং সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে নেবে, তখন মুসলমানরা তা মেনে নিয়ে জিহাদ-যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য। কথা হল এই যে, তারা অকপট ও সত্য মনে ইসলাম কিংবা সন্ধিচুক্তিকে গ্রহণ করল, এবং তাতে কোন প্রতারণা নিহিত রয়েছে কিনা সে বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা যথার্থভাবেই দেখেন ও অবগত রয়েছেন। তারা যদি এমনটি করে তবে তার জন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মুসলমানদের এ ধরনের ধারণা ও শংকা-সংশয়ের উপর কোন বিষয়ের ভিত্তি রচনা করা উচিত নয়।

ইসলাম গ্রহণ কিংবা সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের কথা প্রকাশ করার পরেও যদি তাদের উপর হাত তোলা হয়, তবে যারা জিহাদ করেছে তারা অপরাধী হয়ে পড়বে। যেমন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দান করা হয়েছে, যেন আমি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকি যতক্ষণ না তারা কলেমা لا إله إلا الله محمد رسول الله [একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য নেই। আর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল।] এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে এবং যখন তারা তা বাস্তবায়িত করবে, তখন তাদের রক্ত, তাদের ধনসম্পদ সবই নিরাপদ হয়ে যাবে। অবশ্য ইসলামী বিধান মতে কোন অপরাধ করলে সেজন্য তাদের শাস্তি দেয়া যাবে। বস্তুত তাদের মনের হিসাব-নিকাশের ভার থাকবে আল্লাহ্র উপর। তিনি জানবেন, তারা সত্য মনে এই কলেমা এবং ইসলামী আমলসমূহকে কবুল করেছে কি প্রতারণা করেছে।

অপর একটি হাদীস যা হযরত আবূ দাউদ (র) বহুসংখ্যক সাহাবায়ে-কিরামের রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন তা হল এই যে, রসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ লোকের উপর অর্থাৎ এমন কোন লোকের উপর কোন অত্যাচার-উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়, যে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের চুক্তি করে নিয়েছে, কিংবা যদি তার কোন ক্ষতিসাধন করে অথবা তার দ্বারা এমন কোন কাজ আদায় করে যা তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি কিংবা যদি তার কোন বস্তু তার মানসিক ইচ্ছার বাইরে নিয়ে নেয়, তবে কিয়ামতের দিন আমি সে মুসলমানের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির সমর্থন করব।

কোরআনে-হাকীমের আয়াত ও উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনা বাহ্যত মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক আশংকার সম্মুখীন করে দিয়েছে। তা হল এই যে, ইসলামের কোন মহাশত্রুও যখন মুসলমানদের কবলে পড়ে এবং শুধুমাত্র জান বাঁচাবার উদ্দেশ্যে

ইসলামের কলেমা পড়ে নেয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতকে সংযত করে নেওয়া মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মুসলমানদের পক্ষে কোন শত্রুকেই বশ করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন রহস্যাদির ভার নিজের দায়িত্বে রেখে একান্ত মু'জিযাসুলভ ভঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কার্যত মুসলমানদের কোন সময়ক্ষেত্রেই এমন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। অবশ্য সন্ধি অবস্থায় শত শত মুনাফেক সৃষ্টি হয়েছে যারা ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে এবং বাহ্যত নামায-রোযাও পালন করেছে। এর মধ্যে কোন কোন সংকীর্ণ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের তো এ উদ্দেশ্যই ছিল যে, মুসলমানদের থেকে কিছু ফায়দা হাসিল করে নেবে এবং শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের প্রতিশোধের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে। আবার অনেক ছিল যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার জন্য, বিরোধীদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করার জন্য এমনটি করতো। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনে সে সমস্ত ব্যাপারেই মুসলমানদের হিদায়েত দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের সাথেও মুসলমানদের মতই আচরণ করে যতক্ষণ না তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা এবং চুক্তি লংঘনের বিষয় প্রমাণিত হয়ে যায়।

কোরআন করীমের এ শিক্ষা ছিল সে অবস্থার জন্য যখন ইসলামের শত্রুরা নিজেদের শত্রুতা পরিহারের অঙ্গীকার করবে এবং এ ব্যাপারে কোন চুক্তি সম্পাদন করে নেবে।

এ ছাড়া আরেকটি দিক হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের জেদ ও শত্রুতা বজায় রাখতে প্রয়াস পায়। এ সম্পর্কিত হুকুম এর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

অর্থাৎ যদি তারা কথা না মানে, তবে তোমরা এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী, আর তিনি অতি উত্তম সাহায্যকারী এবং অতি উত্তম সমর্থনকারী।

সারকথা এই যে, তারা যদি নিজেদের অত্যাচার-উৎপীড়ন ও কুফরী-শেরেকী থেকে বিরত না হয়, তবে মুসলমানদের জন্য সে নির্দেশই বহাল থাকবে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা। আর জিহাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ যেহেতু স্বভাবত বড় রকম সৈন্যবাহিনী, বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের উপরই নির্ভরশীল এবং মুসলমানদের কাছে পরিমাণে এসব বিষয় ছিল অল্প, কাজেই এমনটি হয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিল না যে, জিহাদের হুকুমটি মুসলমানদের কাছে ভারী বলে মনে হবে কিংবা তারা নিজেদের সংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতার দরুন এমন মনে করতে আরম্ভ

করবেন যে, আমরা মুকাবিলায় সফল হতে পারব না। কাজেই এর প্রতিকারকল্পে মুসলমানদের বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাছে যদিও মুসলমানদের চেয়ে সাজ-সরঞ্জাম বেশি রয়েছে, কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'আলার গায়েবী সাহায্য-সহায়তা কোথায় পাবে যা মুসলমানরা পাচ্ছে এবং তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের মাঝে প্রত্যক্ষ করে থাকে। আরো বলা হয়েছে যে, এমনিতে তো দুনিয়ার সব পক্ষই কারো না কারো কাছ থেকে সাহায্য-সহায়তা অর্জন করেই নেয় কিন্তু কার্যসিদ্ধি হয় সেই সাহায্যদাতার শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞান-অভিজ্ঞানের উপর। একথা বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি-সার্থম্য এবং সূক্ষ্মদর্শিতার চেয়ে বেশি তো দূরের কথা এর সমান সারা বিশ্বেরও হতে পারে না। কেননা তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যদাতা ও পক্ষ সমর্থনকারী।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ
وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ
اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾

---

(৪১) আর এ কথা জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাও তার এক-পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ্‌র জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ্‌র উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর একথাটি জেনে রাখ যে, (কাফিরদের কাছ থেকে) যেসব বস্তু-সামগ্রী গনীমত হিসাবে তোমরা অর্জন কর, তার হুকুম এই যে, (এই সমুদয় মালামালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতে হবে যার চার ভাগ হল যোদ্ধাদের হক আর এক ভাগ অর্থাৎ) তার পঞ্চম ভাগ (আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবে যার এক ভাগ হল) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের। [অর্থাৎ তা রসূলুল্লাহ্ (সা) পাবেন। বস্তুত রসূলকে দেয়াই আল্লাহ্‌র সম্মুখে পেশ করার শামিল।] আর (এক ভাগ হল) তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের এবং (এক ভাগ) এতীমদের, (এক ভাগ) গরীবদের এবং (এক ভাগ) মুসাফিরদের যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখ এবং সে বস্তুর উপর (বিশ্বাস রাখ) যাকে আমি আমার বান্দা [মুহাম্মদ-(সা)-এর] প্রতি পৃথকীকরণের দিন (অর্থাৎ যেদিন বদর

প্রান্তরে মু'মিন ও কাফিরদের) দু'টি সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল; অবতীর্ণ করেছিলাম। (এর মর্ম হল এই সেই গায়েবী সাহায্য যা ফেরেশতাদের মাধ্যমে পাঠান হয়েছিল। অর্থাৎ তোমরা যদি আমার এবং আমার গায়েবী সাহায্য-সহায়তা ও দানের উপর বিশ্বাস রাখ তবে এ নির্দেশটি জেনে রাখ এবং সেমতে আমল কর। কথাটি এজন্য বলে দেয়া হল, যাতে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করতে কষ্ট না হয় এবং এ কথা উপলব্ধি করা যায় যে, গনীমতের যাবতীয় মাল আল্লাহ্‌র সাহায্যেই অর্জিত হয়েছে। কাজেই এর এক-পঞ্চমাংশ যদি নাও পাওয়া যায়, তাতে কি হল; যে চার ভাগ পাওয়া গেল তাও তোমাদের ক্ষমতাবহির্ভূতই ছিল। একান্ত আল্লাহ্‌র ক্ষমতাবলেই তা লাভ হয়েছে)। আর আল্লাহ্‌ই সমস্ত বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাশীল। (বস্তুত তোমাদের এতটুকু পাবারও অধিকার ছিল না; যা পেলে, তাই অনেক বেশি।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে গনীমতের বিধান ও তার বণ্টননীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর আগে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা শুনে নিন।

অভিযানে 'গনীমত' বলা হয় সে সমস্ত মাল-সামানকে যা শত্রুর নিকট থেকে লাভ হয়। শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী অমুসলমানদের নিকট থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয়, তাকেই বলা হয় 'গনীমত'। আর যা কিছু আপস, সন্ধি-সম্মতির মাধ্যমে অর্জিত হয়, যেমন জিযিয়া কর, খাজনা, ট্যাক্স প্রভৃতি—তাকে বলা হয় فَيْئ-কোরআন করীমে এতদুভয় শব্দের মাধ্যমে (অর্থাৎ 'গনীমত' ও 'ফাউন') এতদুভয় প্রকার মালামালের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আন্‌ফালে সে গনীমতের মালামালের কথাই আলোচিত হয়েছে যা যুদ্ধকালে অমুসলমানদের কাছ থেকে লাভ হয়েছে।

এখানে সর্বাগ্রে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসলামী ও কোরআনী মতাদর্শ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিকানা শুধুমাত্র সে সত্তার জন্য নির্ধারিত যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোন কিছুর মালিকানা লাভ করার একটি মাত্র পন্থা রয়েছে। তা হল এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় আইনের মাধ্যমে কোন বস্তুতে কোন ব্যক্তির মালিকানা সাব্যস্ত করে দেন। যেমন সূরা ইয়াসীনে চতুষ্পদ জীবের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ অর্থাৎ এরা কি দেখতে পায় না যে, চতুষ্পদ জন্তুসমূহ আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি (এবং) তারপর তারা সেগুলির মালিক হয়েছে। অর্থাৎ এদের মালিকানা নিজস্ব নয়; বরং আমিই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে এগুলোর মালিক বানিয়েছি।

কোন জাতি যখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অর্থাৎ কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্বীয় রসূল ও কিতাব পাঠিয়ে থাকেন যে হতভাগা এ আল্লাহ্র দানের মাধ্যমেও প্রভাবিত না হয়, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মর্ম দাঁড়ায় এই যে, এই বিদ্রোহীদের জানমাল সবই হালাল করে দেয়া হয়েছে; আল্লাহ্ প্রদত্ত মালামালের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোন অধিকারই আর তাদের নেই। বরং তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়েছে। এই বাজেয়াপ্ত করা মালামালেরই অপর নাম গনীমতের মাল যা কাফিরদের মালিকানা থেকে বেরিয়ে গিয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানায় চলে আসে।

বাজেয়াপ্ত করা এই মালামালের ব্যাপারে প্রাচীনকালে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম ছিল এই যে, এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোন অনুমতি কারো জন্যই ছিল না, বরং এ ধরনের মালামাল একত্র করে কোন খোলামেলা জায়গায় রেখে দেয়া হত এবং আকাশ থেকে এক ধরনের বিদ্যুচ্ছটা এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিত। আর এটাই ছিল জিহাদ কবুল হওয়ার লক্ষণ।

খাতেমুল-আম্বিয়া (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে কতিপয় বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এও একটি যে, তাঁর উম্মতের জন্য গনীমতের মালামাল ভোগ করা হালাল করে দেয়া হয়েছে। (যেমন বর্ণিত হয়েছে মুসলিমের হাদীস) তাছাড়া হালালও আবার এমন হালাল যে, একে طيب الاموال তথা পরিচ্ছন্নতম সম্পদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, যেসব সম্পদ বা মালামাল মানুষ নিজের উপার্জনের মাধ্যমে অর্জন করে তাতে মানুষের মালিকানা থেকে বিভিন্ন মাধ্যম অতিক্রম করার পর তার মালিকানা বা অধিকারে আসে এবং এসব মাধ্যমের মধ্যে হারাম, অবৈধ অথবা ঘৃণ্য পন্থার আশংকাও থাকে। পক্ষান্তরে গনীমতের মালামালের ক্ষেত্রে কাফিরদের মালিকানা তা থেকে রহিত হয়ে গিয়ে সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা বিদ্যমান থেকে যায় এবং অতপর তা যে লোক প্রাপ্ত হয়, সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা থেকেই প্রাপ্ত হয়। তখন আর তাতে কোনরকম সন্দেহ কিংবা হারাম হওয়ার কোন সংশয়ই থাকে না। যেমন, কূয়া থেকে তোলা পানি কিংবা স্বেচ্ছায় উদ্গত বৃক্ষ, লতাপাতা যা সরাসরি আল্লাহ্র অনুগ্রহের দান মানুষ প্রাপ্ত হয়, কোন মানবিক মাধ্যম তার মাঝে থাকে না, তেমনি।

সারকথা এই যে, যেসব গনীমতের মালামাল পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য হালাল ছিল না, অনুগৃহীত এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্র দান হিসাবে তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে এসবের বণ্টনবিধি وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আরবী অভিধানের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমত ما শব্দটি ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করে। অতপর এই ব্যাপকতার অতিরিক্ত তাকীদের

জন্য مِنْ شَيْءٍ শব্দটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, ছোট-বড় যাই কিছু গনীমতের মাল হিসাবে অর্জিত হবে সে সবই এই নিয়ম-বিধির আওতাভুক্ত। কোন বস্তু সাধারণ বা ক্ষুদ্র মনে করে যদি কেউ বন্টন-বিধির বাইরে নিয়ে নেয়, তবে সে কঠিন অপরাধী বলে গণ্য হবে। কাজেই রসূলে করীম (সা) বলেছেন, একটি সুই-সূতাও যদি মালে গনীমতের অংশ হয়, তবুও কারো পক্ষে তা নিজ অংশের অতিরিক্ত নিয়ে নেয়া জায়েয নয়। বস্তুত নিজ অংশের বাইরে গনীমতের কোন বস্তু নিয়ে নেয়াকে غلول (গুলুল) বলে অভিহিত করে সেজন্য কঠিন ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং একে সাধারণ চুরি অপেক্ষা কঠিন হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বন্টন-বিধির এই শিরোনাম আরোপ করে সমস্ত মুসলমান মুজাহেদীনকে অবহিত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য এই গনীমতের মালামাল হালাল করে দিয়েছেন, কিন্তু তা এক বিশেষ বিধির আওতায়ই হালাল। এই বিধি বহির্ভূত পন্থায় যদি কেউ তা থেকে কোন কিছু নিয়ে নেয় অর্থাৎ আত্মসাৎ করে, তবে তা হবে সাক্ষাৎ জাহান্নামের একটি অংগার।

কোরআনী বিধি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, পৃথিবীর অন্য কোন বিধিই এমন নিখুঁত নয়। আর এটাই হল কোরআনী বিধি-বিধানের পরিপূর্ণ ফলশ্রুতি ও সাফল্যের রহস্য যে, এতে প্রথমে আল্লাহ্ ও পরকালের ভীতির আলোকে তার প্রতি ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, নিদর্শনমূলক শাস্তি প্রবর্তন করা হয়েছে।

অন্যথায় লক্ষণীয় যে, সাক্ষাত সমরাঙ্গনে তুমুল যুদ্ধ চলাকালে যে মালামাল কাফির-দের হাত থেকে অর্জন করা হয়, যার কোন বিস্তারিত বিবরণ না পূর্ব থেকে মুসলমানদের নেতার জানা রয়েছে, না অন্য কারও। অথচ পরিস্থিতি-পরিবেশ হল যুদ্ধের, যা সাধারণত বিয়াবান ময়দান বা প্রান্তরেই সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যাতে লুকিয়ে থাকার বা রাখার অবকাশ থাকে হাজারো রকম। নিরেট আইনের বলে এসব মালামালের রক্ষণাবেক্ষণ কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধুমাত্র আল্লাহ্ভীতিই এমন এক বিষয় ছিল যা প্রতিটি মুসলমানকে এতে সামান্যতম কারচুপি থেকেও বিরত রেখেছিল।

এখন এই বন্টন-বিধিটি লক্ষণীয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ- فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ অর্থাৎ গনীমতের মালামালের এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ্র, তাঁর রসূলের, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের, এতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের জন্য।

এখানে প্রথমত লক্ষণীয় যে, গোটা গনীমতের মালামালের বন্টনবিধিই বর্ণিত হচ্ছে, অথচ কোরআন এখানে শুধুমাত্র তার এক-পঞ্চমাংশের বন্টনবিধি বর্ণনা করেছে, অবশিষ্ট চার ভাগের কোন উল্লেখ করেনি। এতে কি রহস্য থাকতে পারে এবং বাকি চার ভাগের বন্টনবিধিই বা কি? কিন্তু কোরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা করলে এতদুভয় প্রশ্নের উত্তরও এসব বাক্য থেকেই বেরিয়ে আসে। কারণ, কোরআন করীম জিহাদে নিয়োজিত মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছে ঃ مَا غَنِمْتُمْ অর্থাৎ "তোমরা যা কিছু গনীমত হিসাবে অর্জন করেছ। এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এসব মালামাল অর্জনকারীদেরই প্রাপ্য। তারপর যখন বলা হল যে, এসবের মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ্ ও রসূল প্রমুখের প্রাপ্য, তখন এর সুস্পষ্ট ফল দাঁড়াল এই যে, অবশিষ্ট চার ভাগই গনীমত অর্জনকারী ও মুজাহেদীনের প্রাপ্য। যেমন কোরআন করীমের উত্তরাধিকার আইনের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ অর্থাৎ "কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যখন তার পিতামাতা হয়, তখন মাতা পায় এক-ষষ্ঠমাংশ।" এখানেও মায়ের অংশ বলেই শেষ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ হল পিতার অধিকার। তেমনিভাবে مَا غَنِمْتُمْ বলার পর যখন শুধু পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করা হলো তাতেই প্রমাণিত হল যে, অপরাপর চারটি অংশই মুজাহেদীনের হক। অতপর রসূলে করীম (সা)-এর বর্ণনা এবং কার্যধারাও বিষয়টিকে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছে। তিনি অবশিষ্ট চার ভাগই এক বিশেষ বিধি অনুযায়ী মুজাহেদীনের মাঝে বন্টন করে দেন।

এবার সে পঞ্চমাংশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যাক যা কোরআন করীম এ আয়াতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কোরআনের ভাষায় এখানে ছয়টি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ لِلَّهِ - لِلرَّسُولِ - لِذِي الْقُرْبَىٰ - وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

لِلَّهِ (আল্লাহ্র জন্য) শব্দটি সে সমস্ত বন্টন ক্ষেত্রের মধ্যে একটি অতি উজ্জ্বল শিরোনাম, যাতে আলোচ্য এক-পঞ্চমাংশ গনীমতের মাল বণ্টিত হবে। অর্থাৎ এসমুদয় ক্ষেত্রই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য। তাছাড়া এখানে বিশেষভাবে এ শব্দটি ব্যবহার করার মাঝেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, যেদিকে তফসীরে মাযহারিতে ইঙ্গিত করা

হয়েছে। তা হল এই যে, মহানবী (সা) এবং তাঁর খান্দান তথা পরিবার-পরিজনদের জন্য সদকার মালামাল গ্রহণ করাকে হারাম সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। কেননা, তা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার পক্ষে শোভন নয়। তার কারণ, এসব মালামাল সাধারণ মানুষের ধনসম্পদ পবিত্র-পরিচ্ছন্ন তথা পঙ্কিলতামুক্ত করার জন্য মূল সম্পদের মধ্য থেকে পৃথক করে নেয়া হয়। এ মালকে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ أَوْسَاخُ النَّاسِ অর্থাৎ মানুষের গাদ-কাচড়া। এহেন বস্তু নবীপরিবারের যোগ্য নয়।

গনীমতের মালামালের পঞ্চমাংশ থেকে যেহেতু কোরআন রসূলে করীম ও তাঁর খান্দানকেও অংশী সাব্যস্ত করেছে, কাজেই এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, অংশটি লোকদের মালিকানা থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসেনি, বরং সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে এসেছে। যেমন, এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, গনীমতের মাল কাফিরদের অধিকার বা মালিকানা থেকে বেরিয়ে সরাসরিভাবে আল্লাহ্‌র নির্ভেজাল মালিকানায় পরিণত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তা উপহার হিসাবে বিতরণ করা হয়। সে কারণেই এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য যে, রসূলে করীম (সা) ও তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনকে অর্থাৎ ذوى القربى--কে গনীমতের মাল থেকে যে পঞ্চমাংশ দেয়া হয়েছে তা মানুষের সদকা নয়, বরং সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান। আয়াতের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত মালামাল প্রকৃতপক্ষে নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাভুক্ত। তাঁরই নির্দেশ মুতাবিক উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে ব্যয় করা হবে।

সে জন্যই এক-পঞ্চমাংশের প্রকৃত প্রাপক রয়েছে পাঁচটি। (১) রসূল; (২) যাবিল-কোরবা (নিকট আত্মীয়-স্বজন), (৩) এতীম, (৪) মিসকীন এবং (৫) মুসাফির। তারপরেও তাদের প্রাপ্যতার স্তরভেদ রয়েছে। কোরআন করীমের বর্ণনা কৌশল লক্ষ্য করার মত যে, প্রাপ্যতার এসমস্ত পার্থক্যকে কেমন সূক্ষ্ম ও নাজুক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। এই পাঁচটি প্রাপকের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথম দুটিতে 'لام' লাম বর্ণ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে ঃ لِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى- অথচ অপর তিনটিতে 'লাম' ব্যবহারের পরিবর্তে সবগুলোকে একটিকে অন্যটির সাথে জুড়ে দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবী ভাষায় لام বর্ণটি কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। لله শব্দে 'লাম' বর্ণটি মালিকানার এ বৈশিষ্ট্য বা নির্দিষ্টতা প্রকাশ করার

জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, যাবতীয় সম্পদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। আর لِلرَّسُوْلِ শব্দে এর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল প্রাপ্যতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যে, আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন এই এক-পঞ্চমাংশ গনীমতের মালামাল ব্যয়-বন্টন করার অধিকার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করেছেন। ইমাম তাহাবীর গবেষণা এবং তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী এর সারমর্ম এই যে, এখানে যদিও এক-পঞ্চমাংশের ব্যয়ক্ষেত্র বা প্রাপক হিসাবে পাঁচটি খাতের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রসূলে করীম (সা)-এর পরিপূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি নিজের কল্যাণ বিবেচনা অনুসারে এই পাঁচটি ক্ষেত্রেই গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করতে পারেন। যেমন, সূরা আন্‌ফালের প্রথম আয়াতে সমুদয় গনীমতের মালামাল বন্টনের ব্যাপারে এ নির্দেশই ছিল যে, রসূলে করীম (সা) স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় তা যে কোন স্থানে ব্যবহার করতে পারেন, যাকে খুশী দিতে পারেন। অতপর وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ আয়াত গনীমতের মালামালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে তার চার ভাগকে মুজাহেদীনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এর পঞ্চমাংশটি পূর্ববর্তী নির্দেশেরই আওতাভুক্ত রয়ে গেছে। এর ব্যয় করার বিষয়টি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিবেচনার উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এখানে এই পঞ্চমাংশের জন্য পাঁচটি খাত নির্ধারিত করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ অংশটি এই পাঁচটি খাতেই আবর্তিত হতে থাকবে। অবশ্য অধিকাংশ বিজ্ঞ গবেষক ইমামের মতে এই এক-পঞ্চমাংশকে সমানভাবে পাঁচ ভাগ করে আয়াতে বর্ণিত পাঁচটি খাতে সমানভাবে বন্টন করে দেয়া মহানবী (সা)-র জন্য অপরিহার্য ছিল না, বরং এটুকু অপরিহার্য ছিল যে, গনীমতের এই এক-পঞ্চমাংশকে এই পাঁচ প্রকারের সবাইকে অথবা কাউকে কাউকে স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী দান করবেন।

এর সব চাইতে বড় ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এ আয়াতের শব্দাবলী এবং তাতে বর্ণিত মাস্‌রাফ ও ব্যয়খাতসমূহের প্রকারগুলো। কারণ, এসব প্রকার কার্যত পৃথক পৃথক নয়; বরং পারস্পরিক সমন্বিতও হতে পারে। যেমন, যে ব্যক্তি যাবিল-কোরবা বা নিকটাত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে সে এতীমও হতে পারে, মিসকীন কিংবা মুসাফিরও হতে পারে। তেমনিভাবে মিসকীন-মুসাফির হলে সাথে সাথে তার এতীম হওয়াও বিচিত্র নয়। আর সে লোক যাবিল-কোরবাও হতে পারে। তেমনিভাবে যে মিসকীন সে লোক মুসাফিরের তালিকায়ও আসতে পারে। যদি এ সবরকম লোকের মাঝে পৃথকভাবে এবং সবার মাঝে সমান সমান বিতরণ করা উদ্দেশ্য হতো, তবে এক প্রকারের লোক অন্য প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হওয়াটাই হতো বাঞ্ছনীয়। তাহলে দেখা যেত যাবিল-কোরবার যে ব্যক্তি এতীম এবং মুসাফির ও মিসকীনও হতো, তবে প্রত্যেক প্রেক্ষিতের বিবেচনায় একেকটি করে মিলে চারটি অংশই তাকে দেয়া কর্তব্য হয়ে পড়ত। যেমন, মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে নিয়ম রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তির সাথে

বিভিন্ন রকমের নিকটাত্মীয়তার সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে প্রত্যেক নৈকট্যের জন্যই সে পৃথক পৃথকভাবে মীরাসের অংশ পেয়ে থাকে। গোটা উম্মতের কেউ এ মতের প্রবক্তা নন যে, গনীমতের বেলায় কোন এক ব্যক্তিকে চার ভাগ দেয়া যেতে পারে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা)-র উপর এমন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা আয়াতের উদ্দেশ্যই নয় যে, এই পাঁচ প্রকার লোকের সবাইকে অবশ্য অবশ্যই দিতে হবে এবং সমান সমান অংশে দিতে হবে। বরং আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ মাল উল্লিখিত পাঁচ প্রকার লোকের মধ্য থেকে যাকে যে পরিমাণ দিতে চাইবেন, মহানবী (সা) নিজের ইচ্ছামত দিতে পারবেন।---(মাযহারী)

সে কারণেই হযরত ফাতিমা যোহরা (রা) যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট এই এক-পঞ্চমাংশ গনীমতের মধ্য থেকে একটি খাদেমের জন্য আবেদন করলেন এবং সাথে সাথে সংসারের কাজকর্মে নিজের পরিশ্রম, অন্যান্য অসুবিধা এবং নিজের শারীরিক দুর্বলতার কথাও ব্যক্ত করলেন, তখন মহানবী (সা) এই অপারকতার কথা জানিয়ে তাঁকে দান করতে অস্বীকার করলেন যে, আমার সামনে তোমার চেয়ে বেশি অসুবিধায় রয়েছেন সুফফাবাসীরা। তাঁরা সীমাহীন দারিদ্র্য-দুর্দশায় নিপতিত। কাজেই তাঁদের বাদ দিয়ে আমি তোমাকে দিতে পারি না।---(সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

এতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সবরকম লোকের পৃথক পৃথক হক ছিল না। যদি তাই হতো, তবে যাবিল-কোরবার অধিকারে ফাতিমা যোহ্‌রা (রা)-এর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার আর কার থাকতে পারে? সুতরাং এগুলো ছিল প্রাপ্য ক্ষেত্রের বিবরণ, প্রাপ্য অধিকারের বিবরণ নয়।

মহানবী (সা)-র ওফাতের পর এক-পঞ্চমাংশের বণ্টন ঃ অধিকাংশ ইমামের মতে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশের মধ্য থেকে যে অংশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য রাখা হয়েছিল তা তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের সুউচ্চ মর্যাদার ভিত্তিতে তেমনি ছিল যেমন করে তাঁকে বিশেষভাবে এ অধিকারও দেয়া হয়েছিল যে, তিনি সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে নিজের পছন্দ মত যে কোন বস্তু নিতে পারতেন। সে অধিকারবলে কোন কোন গনীমতের মধ্য থেকে মহানবী (সা) কোন কোন বস্তু নিয়েও ছিলেন। আর গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য ভাতাও গ্রহণ করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই অংশ নিজে থেকেই শেষ হয়ে যায়। কারণ, তাঁর পরে আর কোন নবী-রসূল নেই।

যাবিল-কোরবার পঞ্চমাংশ ঃ এতে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশে দরিদ্র নিকটাত্মীয়ের অধিকার বা হক এর অন্যান্য প্রাপক এতীম মিসকীন ও মুসাফিরের অগ্রবর্তী। কারণ নিকটাত্মীয়কে সদকা-যাকাত প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা যায় না, অথচ অন্যান্যের ক্ষেত্রে যাকাত-ফেতরার দ্বারা সাহায্য করা যায়। অবশ্য ধনী নিকটাত্মীয়কে এর মধ্য থেকে দেয়া যাবে কিনা, এ প্রশ্নে হযরত ইমাম আ'যম আবূ-হানীফা (র) বলেন, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) যে নিকটাত্মীয়দের দান করতেন তার দু'টি

ভিত্তি ছিল। (১) তাঁদের দরিদ্র ও অসহায় এবং (২) দীনের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্য-সহায়তা। দ্বিতীয় ভিত্তিটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট থাকতে পারে শুধু দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের বিষয়টি। আর এই ভিত্তিতে কিয়ামত অবধি প্রত্যেক ইমামই তাঁদেরকে অন্যান্যের তুলনায় অগ্রবর্তী গণ্য করবেন। (হিদায়া, জাস্‌সাস) ইমাম শাফেয়ী (র) হতেও এ বক্তব্যই উদ্ধৃত রয়েছে।---(কুরতুবী)

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের মতে যাবিল-কোরবার অংশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নৈকট্যের ভিত্তিতে চিরকাল বলবৎ থাকবে এবং তাতে ধনী-গরীব সবাই শরীক থাকবে। তবে সমকালীন আমীর (শাসক) নিজ বিবেচনায় তাদেরকে অংশ দেবেন।---(মাযহারী) এ ব্যাপারে আদত বিষয়টি হল খোলাফায়ে-রাশেদীনের অনুসৃত রীতি। দেখতে হবে, তাঁরা মহানবী (সা)-র ওফাতের পর কি করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার এ ব্যাপারে লিখেছেন ঃ ان الخلفاء الاربعة الراشدين قسموه على ثلثة اسهم অর্থাৎ চার-জন খোলাফায়ে-রাশেদীনই মহানবী (সা)-র ওফাতের পর গনীমতের এক-পঞ্চমাংশকে মাত্র তিন ভাগে বিভক্ত করে এতীম, মিসকীন ও ফকীরদের মাঝে বিতরণ করেছেন।

অবশ্য ফারূকে আ'যম হযরত উমর (রা) থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি হুযূর (সা)-এর নিকটাত্মীয়ের মধ্যে যাঁরা গরীব ও অভাবী ছিলেন, তাঁদেরকেও গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে দিয়ে থাকতেন।---(আবূ দাউদ) বলা বাহুল্য, এটা শুধুমাত্র হযরত উমর ফারূকেরই রীতি ছিল না, অন্য খলীফারাও তাই করতেন।

আর যেসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রা) ও হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁদের খিলাফতের শেষকাল পর্যন্তই যাবিল কোরবার হক সে মাল থেকে পৃথক করে নিতেন এবং হযরত আলী (রা)-কে তার মুতওয়াল্লী বানিয়ে যাবিল-কোরবার মধ্যে বিতরণ করাতেন। (যেমনটি বর্ণিত রয়েছে ইমাম আবূ ইউসুফ রচিত কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে।) তবে এটা তার পরিপন্থী নয় যে, তা দরিদ্র যাবিল-কোরবার মাঝে বণ্টন করার জন্যই নির্ধারিত ছিল।

উপকার্য ঃ রসূলে করীম (সা) স্বীয় কার্যের মাধ্যমে যাবিল-কোরবা তথা নিকটাত্মীয়ের নির্ধারণ এভাবে করেছেন যে, বনূ হাশিম তো তাঁর নিজের গোত্র ছিলই তার সাথে বনূ মুত্তালিবকেও এজন্য সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন যে, এরা ইসলাম কিংবা জাহেলিয়াত কোন কালেই বনূ হাশিম থেকে আলাদা হয়নি। এমনকি মক্কার কোরাইশরা যখন বনূ হাশিমের প্রতি খাদ্য অবরোধ করে এবং তাদেরকে শে'আবে আবী তালেবের মধ্যে অন্তরীণ করে দেয় তখন যদিও বনূ মুত্তালিবকে তারা এ বয়কটের অন্তর্ভুক্ত করেনি, কিন্তু এরা নিজেরা স্বেচ্ছায়ই এই বয়কটে শরীক হয়ে যায়।---(মাযহারী)

বদর যুদ্ধের দিনটিই ইয়াওমুল-ফোরকান ঃ আলোচ্য আয়াতে বদরের দিনটিকেই 'ইয়াওমুল ফোরকান' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, সর্বপ্রথম

বাহ্যিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে মুসলমানদের প্রকৃত বিজয় এবং কাফিরদের নিদর্শনমূলক পরাজয় এ দিনটিতেই সূচিত হয় এবং এরই ভিত্তিতে দিনটিতে কুফর ও ইসলামের বাহ্যিক পার্থক্যও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ
أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِن
لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ
وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِذْ
يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ
وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى
اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

(৪২) আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গনের এ প্রান্তে আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নিচে নেমে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল,----যাতে সে সব লোক নিহত হওয়ার ছিল, প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বাঁচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। (৪৩) আল্লাহ্ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফিরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন; বেশি করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন; যা কিছু অন্তরে রয়েছে। (৪৪) আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্য দল মুকাবিলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ্ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌঁছায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এটা সে সময়ের কথা যখন তোমরা সে ময়দানের এ প্রান্তে ছিলে আর ওরা (অর্থাৎ কাফিররা) ছিল ময়দানের সে প্রান্তে। (এ প্রান্তে বলতে মদীনার নিকটবর্তী এলাকা আর সে প্রান্তে বলতে মদীনা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী এলাকাকে বোঝানো হয়েছে।) আর (কোরাইশদের) সে কাফেলা তোমাদের থেকে নিচের দিকে (নিরাপদে) ছিল। (অর্থাৎ সাগরের তীরে তীরে চলে যাচ্ছিল। অর্থাৎ একান্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে চলছিল। উভয় দলই সামনাসামনি এগিয়ে আসছিল। ফলে উভয় দলই একে অপরকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সেদিককার কাফেলা পথেই ছিল, যার ফলে কাফির বাহিনীর মনে তার সাহায্যপ্রাপ্তির ধারণা ছিল বদ্ধমূল। কাজেই উত্তেজনা অধিকতর বেড়ে যায়। যাহোক, সেটি ছিল এমনই এক কঠিন পরিস্থিতি। কিন্তু তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য গায়েবী সাহায্য নাযিল করেন। যেমন উপরে বলা হয়েছে ঃ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا আর (তাও ভাগ্যের বিষয় এই হয়েছে, হঠাৎ করে মুখোমুখি হয়ে যায়। তা না হলে) যদি (সাধারণ রীতিঅভ্যাস অনুযায়ী পূর্ব থেকে) তোমরা এবং তারা (যুদ্ধের জন্য) কোন বিষয় নির্ধারণ করে নিতে (যে, অমুক সময়ে যুদ্ধ করব) তবে (অবস্থার প্রেক্ষিতে তোমাদের মাঝে এই নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিত। তা মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের নিঃসম্বলতার দরুনই মতবিরোধ হোক কিংবা কাফিরদের সাথেই মতানৈক্য হোক, এদিককার সম্বলহীনতা আর ওদিকে মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতির দরুন এ যুদ্ধের হয়তো সুযোগই আসত না। অতএব, এতে যে ফলাফল দাঁড়িয়েছে তাও হতো না যার আলোচনা করা হয়েছে لِيَهْلِكَ আয়াতে।) কিন্তু (আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন যাতে সে মতবিরোধের কোন সুযোগই আসেনি; অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল) যাতে করে সে বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটে যা আল্লাহ্ তা'আলা মঞ্জুর করে রেখেছেন (অর্থাৎ সত্যের নিদর্শন যাতে প্রকাশ হয়ে যায়।) এবং যাতে সে নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর যার ধ্বংস (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট) হওয়ার বিষয় আল্লাহ্ মঞ্জুর করে রেখেছেন, সে ধ্বংস হয়ে যায়। আর যারা জীবিত থাকার (অর্থাৎ সুপথগামী থাকার) তারা (-ও) যেন নিদর্শন প্রকাশের পর জীবিত থাকতে পারে। (অর্থাৎ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যাতে একটি বিশেষ পন্থায় ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পেতে পারে। সংখ্যা ও সামর্থ্যের এহেন স্বল্পতা সত্ত্বেও যেন মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে যেতে পারে, যা একান্তই অস্বাভাবিক। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম সত্য। বস্তুত এতে আল্লাহ্র প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করেছে। এরপরেও যারা পথভ্রষ্ট হবে সে সত্য প্রকাশের পরই তা হবে--ফলে তার আযাবপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়ে পড়বে, আপত্তির কোন অবকাশ থাকবে না। তেমনিভাবে যার ভাগ্যে হিদায়তপ্রাপ্তি রয়েছে, সে সত্যকেই গ্রহণ করবে।) আর এতে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (তিনি জানেন, কে এই সত্য প্রকাশের পর মুখে ও অন্তরে কুফরী

অবলম্বন করে কিংবা ঈমান আনে। আর) সে সময়টিও স্মরণ করার মত, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নযোগে সে লোকদের সংখ্যা কম করে দেখিয়েছেন (বস্তুত আপনি যখন এ স্বপ্নের বিষয় সাহাবীদের অবহিত করেন, তখন তাদের মনোবল বেড়ে যায়।) আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সংখ্যা আপনাকে বেশি করে দেখাতেন (এবং আপনি তা সাহাবীদের অবহিত করতেন), তাহলে (হে সাহাবীগণ,) তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এই (যুদ্ধের) ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক (মতবিরোধ ও) বিবাদ-বিসংবাদ (সৃষ্টি) হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদেরকে এই মনোবল হারিয়ে ফেলতে এবং বিরোধের হাত থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি মনের কথা যথার্থভাবে জানেন। (এক্ষেত্রেও তিনি জানতেন যে, এভাবে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে আর ওভাবে শক্তি সঞ্চারিত হবে। কাজেই তিনি এ ব্যবস্থাই করেছেন)। এবং (স্বপ্নযোগে কম দেখানোর উপরই শুধু ক্ষান্ত করেননি, উপরন্তু রহস্য বাস্তবায়নকল্পে সম্মুখ সমরে মুসলমানদের দৃষ্টিতেও কাফিরদের সংখ্যা অল্প দেখা যায়। পক্ষান্তরে কাফিরদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়, যা বাস্তবসম্মতও ছিল বটে। অতএব বলা হয়েছে,) সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুকাবিলার সময় তোমাদের দৃষ্টিতে কাফিরদের সংখ্যা কম করে দেখাচ্ছিলেন। আর (তেমনিভাবে) তাদের চোখে তোমাদের সংখ্যা কম করে দেখাচ্ছিলেন, যাতে আল্লাহ্ কর্তৃক মঞ্জুরকৃত কাজটির পূর্ণতা সাধন করে দেন। (যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ) বস্তুত সমস্ত মোকদ্দমাই আল্লাহ্‌র দরবারে রুজু করা হবে (তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জীবিত অর্থাৎ পথভ্রষ্ট ও হিদায়তপ্রাপ্তকে শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বদর যুদ্ধ ছিল কুফর ও ইসলামের সর্বপ্রথম সংঘর্ষ, যা বাহ্যিক ও বস্তুগত উভয় দিক দিয়েই ইসলামের মহত্ত্ব ও সত্যতা প্রমাণ করেছে। সে কারণেই কোরআন করীম এর বিস্তারিত বর্ণনা দেবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। আলোচ্য আয়াতেও তারই বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ আলোচনায় বহুবিধ তাৎপর্য ও কল্যাণ ছাড়াও একটি বিশেষ উপকারিতা এই নিহিত রয়েছে যে, এ যুদ্ধে বাহ্যিক ও বস্তুগত দিক দিয়ে মুসলমানদের বিজয় লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। মক্কাবাসী মুশরিকীনদের পরাজয়েরও কোন লক্ষণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌র অদৃশ্য শক্তি সমস্ত প্রয়োজন ও বাহ্যিক ব্যবস্থার রূপ পাল্টে দিয়েছেন। এ ঘটনার বিশ্লেষণের জন্য এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যার পূর্বে কয়েকটি শব্দ এবং সেগুলোর আভিধানিক বিশ্লেষণ লক্ষণীয়।

عُدْوَةٌ এর অর্থ হয় 'এক দিক'। আর دُنْيَا শব্দটি গঠিত হয়েছে اَدْنٰى শব্দ থেকে। এর অর্থ---নিকটতর। আখেরাতের তুলনায় এ পৃথিবীকেও دُنْيَا এ

জন্যই বলা হয় যে, এটি আখিরাতের জীবনের তুলনায় মানুষের খুবই নিকটবর্তী আর قُصْوٰى শব্দটি اَقْصٰى থেকে গঠিত। اَقْصٰى অর্থ অতি দূরবর্তী।

উনচল্লিশতম আয়াতে 'ধ্বংসপ্রাপ্তি' এবং তার বিপরীতে 'জীবন লাভ'-এর উল্লেখ রয়েছে। এ শব্দ দুটির দ্বারা বাহ্যিক মৃত্যু ও জীবন উদ্দেশ্য নয় বরং এর অর্থ হল মর্মগত মৃত্যু ও জীবন তথা ধ্বংস ও মুক্তি। মর্মগত জীবন হল ইসলাম ও ঈমান আর মৃত্যু হল শিরক ও কুফর। কোরআন করীম বেশ কয়েক জায়গাতেই এ অর্থে শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ـ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের কথা মান, যখন তাঁরা তোমাদের এমন বিষয়ের প্রতি আহবান করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।"

এখানে জীবন বলতে সেই প্রকৃত জীবন এবং চিরন্তন শান্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের বিনিময় লাভ হয়। তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যা হল এই যে, ৪২তম আয়াতে বদর সমরাঙ্গনের পটভূমির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ছিল عُدْوَةٌ دُنْيَا-এর নিকটবর্তী আর কাফিররা ছিল عُدْوَةٌ قُصْوٰى-এর নিকটবর্তী। মুসলমানদের অবস্থান এই সমারঙ্গনের সেই প্রান্তে ছিল, যা ছিল মদীনার কাছাকাছি। আর কাফিররা ছিল সমরাঙ্গনের অপর প্রান্তে, যা মদীনা থেকে দূরবর্তী ছিল। আর আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা যার কারণে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তাও মক্কা থেকে আগত সৈন্যদের নিকটবর্তী, মুসলমানদের নাগালের বাইরে তিন মাইলের ব্যবধানে সাগরের তীর ধরে চলে যাচ্ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের এই নকশা বা পটভূমি বর্ণনার উদ্দেশ্য হল এ বিষয়টি বাতলে দেয়া যে, যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে মুসলমানরা একান্ত ভ্রান্ত স্থান ও পরিবেশে অবস্থান করছিল। সেখান থেকে বাহ্যত শত্রুকে কাবু করা তো দূরের কথা, আত্মরক্ষার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। তাছাড়া তাদের নিকট পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ মদীনা থেকে দূরবর্তী যে প্রান্তে কাফিররা শিবির স্থাপন করেছিল, তা ছিল পরিষ্কার, সমতল ভূমি। পানিও তাদের নিকট ছিল।

এ যুদ্ধক্ষেত্রের উভয় প্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করে (প্রকারান্তরে) এ কথাও বাতলে দেয়া হয়েছে যে, উভয় সৈন্যবাহিনীই একেবারে সামনাসামনি অবস্থান করছিল, যাতে কারো শক্তি কিংবা দুর্বলতাই অপরের কাছে গোপন থাকতে পারে না। তদুপরি এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকদের মনে এই নিশ্চয়তা বদ্ধমূল ছিল যে, আমাদের কাফেলা মুসলমানদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এখন প্রয়োজন হলে তারাও

আমাদের সাহায্য করতে পারে। অপরদিকে মুসলমানরা অবস্থানের দিক দিয়েও ছিল কষ্ট ও পেরেশানীর মাঝে, আর কোনখান থেকে অতিরিক্ত সাহায্যেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুত একথা পূর্ব থেকে নির্ধারিত এবং যে কোন লেখাপড়া লোকেরই জানা যে, মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট তিন শ' তের জন। অপরপক্ষে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। মুসলমানদের কাছে না ছিল যথেষ্ট সংখ্যক সওয়ারী, না ছিল অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য। পক্ষান্তরে কাফির বাহিনী সব দিক দিয়েই ছিল সুসজ্জিত।

এ জিহাদে মুসলমানরা কোন সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মুকাবিলার প্রস্তুতি নিয়েও বের হয়নি, বরং আপাতত একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে পথে বাধা দিয়ে শত্রুদের শক্তিকে দমিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মাত্র তিন শ' তেরজন মুসলমান নিরস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে এক হাজার জওয়ানের এক সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে মুকাবিলা হয়ে যায়।

কোরআনের এ আয়াতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের দৃষ্টিতে এ ঘটনাটি যদিও একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার মত অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে গেছে বলে মনে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে যত আকস্মিক বিষয়ই অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে, সেগুলোর পর্যায় ও রূপ যদিও আকস্মিকতার মতই দেখা যায়, কিন্তু বিশ্বস্রষ্টার দৃষ্টিতে সে সমস্ত কিছুই একটা সুদৃঢ় ব্যবস্থার একেকটি কড়া। সেগুলোর মাঝে কোন একটি বিষয়ও ব্যতিক্রমী কিংবা অসংলগ্ন নয়। তবে গোটা ব্যবস্থাপনাটি যখন মানুষের সামনে এসে যায়, তখনই তারা বুঝতে পারে, এ আকস্মিকতার মাঝে কি কি রহস্য ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

বদর যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। এর আকস্মিক ও অনিচ্ছাকৃত প্রকাশের মাঝে এই তাৎপর্য নিহিত ছিল যে, وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ

অর্থাৎ সাধারণ যুদ্ধসমূহের মত এ যুদ্ধটিও যদি সমস্ত দিক সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং পারস্পরিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করা হতো, তবে অবস্থার তাকাদা অনুসারে আদৌ যুদ্ধ হতো না। বরং এতে মতবিরোধই দেখা দিত। তা মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা ও দুর্বলতা এবং প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্য ও প্রচণ্ড শক্তির প্রেক্ষিতেই মতপার্থক্য হোক কিংবা উভয় পক্ষের অর্থাৎ মুসলমান ও কাফিরদের নির্ধারিত সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হওয়ার দরুনই হোক। মুসলমানগণ নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও দুর্বলতার জন্য হয়তো যুদ্ধে এগিয়ে যাবার সাহস করতো না। আর কাফিরদের উপরও যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতাপ জমিয়ে রেখেছিলেন, সুতরাং তারাও সংখ্যাধিক্য এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও সম্মুখ সমরে আসতে ভয় করত।

কাজেই প্রকৃতির সুদৃঢ় ব্যবস্থা উভয় পক্ষেই এমন অবস্থার সৃষ্টি করে দেয় যে, তেমন বেশি একটা চিন্তা-ভাবনার সুযোগই হল না। মক্কাবাসীদের আবূ সুফিয়ানের

ভীত-সন্ত্রস্ত কাফেলার আর্ত ফরিয়াদ কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এক ভয়াবহ রূপে সামনে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করল, আর মুসলমানদের এগোতে উৎসাহিত করল তাদের এ ধারণা যে, আমাদের সামনে মুকাবিলা করার মত কোন সুসজ্জিত বাহিনী নেই; আছে একটি সাধারণ বাণিজ্যিক কাফেলা। কিন্তু মহাজ্ঞানী-মহাজনের উদ্দেশ্য ছিল উভয় পক্ষের মাঝে একটা আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ হয়ে যাওয়া। আর তাতে করে যেন এ যুদ্ধের পেছনে ইসলামের যে বিজয়সূচক ফলাফল নিহিত রয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যায়। সেজন্যই বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি বা অবস্থা সত্ত্বেও এজন্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েই গেল, যেন আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজের সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন তা পূর্ণ করে দেখিয়ে দেন। আর তা ছিল এই যে, এক হাজার জওয়ানের সশস্ত্র ও সমরোপকরণে সমৃদ্ধ বাহিনীর মুকাবিলায় তিন শ' তের জন নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল ক্ষুধার্ত মুসলমানের একটি ক্ষুদ্র দল---আবার তাও যুদ্ধের অবস্থানের দিক দিয়ে একান্ত অনোপযোগী স্থান থেকেও যখন এ পাহাড়ের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন এ পাহাড়ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং এই সামান্য দলটি হয় বিজয়ী, যা সুস্পষ্টভাবে এ কথারই চাক্ষুস প্রমাণ যে, এদের পিছনে কোন মহাশক্তি কাজ করছিল, যা থেকে বঞ্চিত ছিল এই এক হাজারের বাহিনী। তাছাড়া এ কথাও সুস্পষ্ট যে, তাদের সমর্থন ছিল ইসলামের দরুন এবং ওদের বঞ্চিতি ছিল কুফরীর কারণে। তাতে করে প্রতিটি বুদ্ধিমান-বিবেচক মানুষ বুঝতে পারল সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য। সে কারণেই আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে ঃ

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

অর্থাৎ বদরের ঘটনায় ইসলামের সুস্পষ্ট সত্যতা এবং কুফরের অসত্য ও বর্জনীয় হওয়ার বিষয়টি এজন্য খুলে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে যারা ধ্বংসের সম্মুখীন হতে চায়, তারা যেন দেখে শুনেই তাতে পা বাড়ায়, আর যারা বেঁচে থাকতে চায় তারাও যেন দেখে-শুনেই বেঁচে থাকে; কোনটাই যেন অন্ধকারে এবং ভুল বোঝাবুঝির মাঝে না হয়।

এ আয়াতের শব্দগুলোর মধ্যে 'হালাক' বা ধ্বংসের দ্বারা কুফরীকে এবং 'হায়াত' বা জীবন শব্দের দ্বারা ইসলামকে বোঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সত্য বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবার পর ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা এবং ওজর-আপত্তির কারণ শেষ হয়ে গেছে। এখন যে লোক কুফরী অবলম্বন করবে সে চোখে দেখেই ধ্বংসের দিকে যাবে আর যে লোক ইসলাম অবলম্বন করবে সে দেখে শুনেই চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন গ্রহণ করবে। অতপর বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা

যথেষ্ট শ্রবণকারী, সবার মনের গোপন কুফরী ও ঈমান পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাঁর সামনে রয়েছে এবং এগুলোর শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কেও তিনি পরিজ্ঞাত।

৪৩ ও ৪৪তম আয়াতে প্রকৃতির এক অপূর্ব বিস্ময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা বদর যুদ্ধের ময়দানে এই উদ্দেশ্যে কার্যকর করা হয়, যাতে উভয় বাহিনীর কোন একটিও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে যুদ্ধের অনুষ্ঠানকেই না শেষ করে দেয়। কারণ, এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে বস্তুগত দিক দিয়েও ইসলামের সত্যতার বিকাশ ঘটানো ছিল নির্ধারিত।

বস্তুত প্রকৃতির সে বিস্ময়টি ছিল এই যে, কাফির বাহিনী যদিও তিন গুণ বেশি ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র স্বীয় পরিপূর্ণ ক্ষমা ও কুদরতবলে তাদের সংখ্যাকে মুসলমানদের চোখে কম করে দেখিয়েছেন, যাতে মুসলমানদের মধ্যে কোন দুর্বলতা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়ে না যায়। আর এ ঘটনাটি ঘটে দু'বার। একবার মহানবী (সা)-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হয় এবং তিনি বিষয়টি মুসলমানদের কাছে বলেন। তাতে তাদের মনোবল বেড়ে যায়। আর দ্বিতীয়বার ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয় পক্ষ সামনা-সামনি হয়, তখন মুসলমানদের তাদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়। সুতরাং ৪৩তম আয়াতে স্বপ্নের ঘটনা এবং ৪৪তম আয়াতে প্রত্যক্ষ জাগ্রত অবস্থার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষীয় বাহিনীকে এমন দেখাচ্ছিল যে, আমি আমার নিকটবর্তী একজনকে বললাম, এরা গোটা নব্বইয়েক লোক হতে পারে। পাশের লোকটি বলল, না, তা নয়---শতেক হতে পারে হয়তো।

শেষ আয়াতে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে—يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছেন। এর অর্থ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সে সংখ্যাই তাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষেই অল্প ছিল। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে যে সংখ্যা মুসলমানদের ছিল, তার চেয়েও কম করে দেখিয়েছেন। যেমন, কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, আবূ-জাহ্‌ল মুসলমানদের বাহিনী দেখে তার সাথীদের বলেছিল যে, তাদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে না, যাদের খোরাক একটি উট হতে পারে। আরবে কোন বাহিনীর সংখ্যা কতটি জীব তাদের খাবার জন্য যবাই করা হয় তারই ভিত্তিতে অনুমান করা হত। একশ লোকের খোরাক ধরা হত একটি উট। রসূলে করীম (সা) নিজেও বদর সমরাঙ্গনে মক্কার কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা জানার জন্য সেখানকার কতিপয় লোককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের বাহিনীতে দৈনিক ক'টি উট যবাই করা হয়? তখন তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, দশটি উট যবাই করা হয়। তাতেই তিনি সৈন্য সংখ্যা এক হাজার বলে অনুমান করে নেন। সারকথা, আবূ জাহ্‌লের দৃষ্টিতে

মুসলমানদের সংখ্যা মোট শতেক দেখানো হয়। এখানেও কম করে দেখানোর তাৎপর্য এই যে, কাফিরদের মনে মুসলিম ভীতি যেন পূর্ব থেকে আচ্ছন্ন হয়ে না যায়, যার ফলে তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ যা হোক, আয়াতটির দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, কোন কোন সময় মু'জিযা ও অলৌকিকতা স্বরূপ চোখের দেখাও ভুল প্রতিপন্ন হয়ে যেতে পারে। যেমনটি এক্ষেত্রে হয়েছে।

সেজন্যই এখানে পুনর্বার বলা হয়েছেঃ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا

অর্থাৎ এহেন কুদরতী বিস্ময় এবং চোখের দৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ এ কারণে প্রকাশ হয় যাতে সে কাজটি সুসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে, যা আল্লাহ্ করতে চান। অর্থাৎ মুসলমানদের তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও বিজয় দান করে ইসলামের সত্যতা এবং তার প্রতি অদৃশ্য সমর্থন প্রকাশ পায়। বস্তুত এ যুদ্ধের যা উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে তা পূর্ণ করে দেখিয়ে দেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সব বিষয়ই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে; তিনি যা ইচ্ছা করবেন এবং যেমন ইচ্ছা নির্দেশ দেবেন। তিনি অল্পকে অধিকের উপর এবং দুর্বলকে শক্তির উপর বিজয়ী করে দিতে পারেন, অল্পকে অধিক, অধিককে অল্পে পরিণত করতে পারেন। সুতরাং মাওলানা রূমী বলেনঃ

گر تو خواهی عین غم شادی شود
عین بند پائے آزادی شود
چوں تو خواهی آتش آب خوش شود
ور تو خواهی آب هم آتش شود
خاک و باد و آب و آتش بنده اند
با من و تو مرده با حق زنده اند

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا

كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝٤٧

(৪৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। (৪৬) আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। (৪৭) আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহ্‌র পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুত আল্লাহ্‌র আয়ত্তে রয়েছে সে সমস্ত বিষয়, যা তারা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, (কাফিরদের) কোন দলের সাথে যখন তোমাদের (জিহাদে) মুকাবিলা করার সুযোগ আসে, তখন (এসব নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, প্রথমত) সুদৃঢ় থাকবে (পালিয়ে যাবে না)। আর (দ্বিতীয়ত) খুব বেশি পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকবে। (কারণ, যিকর তথা আল্লাহ্‌র স্মরণ আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পায়।) আশা করা যায়, (এতে করে) তোমরা যুদ্ধে কৃতকার্য হয়ে যাবে। (কারণ, দৃঢ়তা আর মনোবল যখন একত্রিত হয়ে যায়, তখন বিজয়াশা প্রবল হয়ে যায়।) আর (তৃতীয়ত যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে) আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে (যাতে কোন একটি কাজও শরীয়ত বিরোধী না হয়।) আর (চতুর্থত নিজেদের নেতার সাথে কিংবা) পারস্পরিকভাবে কোন বিবাদ করবে না। অন্যথায় (পারস্পরিক অনৈক্যের দরুন) হীনবল হয়ে পড়বে। (কারণ, তাতে করে তোমাদের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং একে অন্যের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। আর একা কোন লোক কিইবা করতে পারে?) আর তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। (প্রভাব চলে যাওয়া অর্থ তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কারণ অন্যরা যখন এই মতবিরোধ সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হবে।) আর (পঞ্চমত কখনো কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখা দিলে সেজন্য ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যই হয় সাহায্যের কারণ।) আর (ষষ্ঠত নিয়তকে নির্ভেজাল রাখবে, দম্ভ কিংবা লোক দেখানোর ক্ষেত্রে) সেই (কাফির) লোকদের মত হবে না, যারা (এই বদরের ঘটনাতেই) নিজেদের অবস্থান থেকে দম্ভভরে এবং লোকদের (নিজেদের আড়ম্বর ও সাজসরঞ্জাম) প্রদর্শন

করতে করতে বেরিয়ে এসেছে। "আর (এহেন দম্ভ ও লোক দেখানোর সাথে সাথে তাদের নিয়ত ছিল) মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে (অর্থাৎ দীন থেকে) বিরত রাখা। (কারণ, তারা মুসলমানদের অপমান করতে যাচ্ছিল। যার প্রতিক্রিয়াও মূলত ধর্ম থেকে সাধারণ লোকের দূরত্ব বিধান।) বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'আলা (সে লোকদেরকে পুরোপুরি শাস্তি দান করবেন। সুতরাং) তাদের কৃতকর্মকে তিনি (স্বীয় জ্ঞানের) বেষ্টনীতে নিয়ে নিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুদ্ধ-জিহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কোরআনের হিদায়তঃ প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য এবং শত্রুর মুকাবিলার জন্য একটি বিশেষ হিদায়তনামা দান করেছেন, যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনের কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও এতেই নিহিত। আর তা হল কয়েকটি বিষয়।

প্রথমত দৃঢ়তা ঃ অর্থাৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা দুই-ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো মন দৃঢ় এটা এমন বিষয় যা মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজেদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কারণ, অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সবচাইতে কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকেজো, বেকার।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র যিকর। এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদাররা ছাড়া সাধারণ পৃথিবী গাফিল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহিনী সুদৃঢ় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হিদায়ত, এই নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মুতাবিক যে কোন অঙ্গনে যে কোন জাতির সাথে মুকাবিলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহর যিকরের নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে তা তো যথা-স্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি যা একজন দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মুকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বিপদ যত কঠিন হোক না কেন, আল্লাহ্‌র স্মরণ সে সমস্ত হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে রাখে।

এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় স্বভাবত এমন এক সময় যখন কেউ কাউকে স্মরণ করে না; সবাই শুধুমাত্র নিজেদের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে।

সেজন্যই জাহিলিয়াত আমলের আরব কবিরা যুদ্ধের ময়দানেও নিজেদের প্রেমাস্পদ প্রেয়সীদের স্মরণ করে গর্ববোধ করত যে, এটা যথার্থই বলিষ্ঠ মনোবল ও প্রেমে পরিপক্কতার প্রমাণ বটে। জাহিলিয়াত আমলের কোন এক কবি বলেছেনঃ

ذكرتك والخطى يخطر بيننا

অর্থাৎ আমি তখনও তোমার কথা স্মরণ করেছি, যখন আমাদের মাঝে বর্শা বিনিময় চলছিল।

কোরআনে করীম এহেন শংকাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদের আল্লাহ্‌র স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে; তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাকীদসহ।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কোরআনে আল্লাহ্‌র যিকর ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম নেই-صلوٰة كثيرًا অথবা صياما كثيرًا কোথাও উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র যিকর তথা স্মরণ এমন সহজ একটি ইবাদত যে, তাতে না তেমন কোন বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম এবং নাইবা অন্য কোন কাজের কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহ্‌র যিকরের জন্য কোন শর্তাশর্ত, কোন বাধ্যবাধকতা, ওযু কিংবা পবিত্রতা পোশাকাশাক এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোন নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থায় ওযুর সাথে, বিনা ওযুতে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে পারে। এর পরেও যদি ইমাম জাযারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিস্‌নে হাসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র যিকর শুধু মুখে কিংবা মনে মনে যিকর করাকেই বলা হয় না বরং প্রতিটি জায়েয বা বৈধ কাজ আল্লাহ্ রসূলের আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সবই যিক্‌রুল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত, তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী যিক্‌রুল্লাহ্‌র মর্ম এত ব্যাপক ও সহজ হয়ে যায় যে, নিদ্রিত মানুষকেও যাকের বলা যেতে পারে। যেমন, কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছেঃ –نوم العالم عبادة অর্থাৎ আলিম ব্যক্তির ঘুমও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যে আলিম তার ইলমের চাহিদা অনুযায়ী আমল করেন তার জন্য তাঁর নিদ্রা, তাঁর জাগরণ সবই আল্লাহ্‌র আনুগত্যের আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহেদীনের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেওয়া হল বলে মনে হয় যা স্বভাবতই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র যিক্‌রের এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনও কোন পরিশ্রম তো হয়ই না, বরং এতে একটা সুখকর অনুভূতি, একটা

শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজকর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতেও কষ্ট-পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোন একটা বাক্য কিংবা কোন গানের কলি কাজের ফাঁকেও গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কোরআন করীমে মুসলমানদের তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অর্থাৎ তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্‌র যিকরের দু'টি গোপন রহস্য স্মরণ রাখ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও কৃতকার্যতা তোমাদেরই হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের একটি যিকর তো হলো তাই, যা সাধারণত 'না'রায়ে তকবীর'-এর শ্লোগানের মাধ্যমে করা হয়। এ ছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর ভরসার খেয়াল রাখা, তাঁরই উপর নির্ভর করতে থাকা, তাঁর কথা মনে রাখা প্রভৃতি সবই 'যিক্‌রুল্লাহ্‌'-র অন্তর্ভুক্ত।

৪৬ তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্যভাবে পালন কর। কারণ, আল্লাহ্‌র সাহায্য-সমর্থন শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও আনুগত্যহীনতা আল্লাহ্‌ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও বঞ্চনার কারণ হয়ে থাকে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কোরআনী হিদায়তনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হল اطاعت ও ذكر الله - ثبات অর্থাৎ দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহ্‌র যিকর ও আনুগত্য। অতপর বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا এতে ক্ষতিকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَنَازَعُوا অর্থাৎ তোমরা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না। তা হলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের বল ভেঙে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে।

এতে বিবাদ-বিসংবাদের দু'টি পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। (১) তোমরা ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়বে এবং (২) তোমাদের বল ভেঙে যাবে, তোমরা শত্রুর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে পড়বে। পারস্পরিক ঝগড়া ও বিবাদ-বিসংবাদের দরুন অন্যের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে পড়া একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, কিন্তু এতে নিজের শক্তির উপর এমন কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে যার কারণে দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়তে হবে? এর

উত্তর এই যে, পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির সাথে গোটা দলের শক্তি সংযুক্ত থাকে। ফলে এককভাবে ব্যক্তি ও নিজের মাঝে গোটা দলের সমপরিমাণ শক্তি অনুভব করে। পক্ষান্তরে যখন পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাস থাকে না, তখন ব্যক্তির একার ক্ষমতাই থেকে যায়, যা যুদ্ধ-বিগ্রহের বেলায় কোন কিছুই নয়।

তারপরে বলা হয়েছে ঃ- وَاصْبِرُوا অর্থাৎ অবশ্য ধৈর্য ধারণ কর। বাক্যের বিন্যাস ধারায় প্রতীয়মান হয় যে, এতে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাবার একান্ত কার্যকর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এই যে, কোন দলের মত ও উদ্দেশ্যে যত ঐক্যই থাক না কেন, কিন্তু ব্যক্তি মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া কোন উদ্দেশ্য লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের মতপার্থক্য থাকা অপরিহার্য। কাজেই অন্যের সাথে চলতে গিয়ে এবং অন্যকে সঙ্গে রাখতে গিয়ে মানুষকে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়েও ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতার স্বভাব গড়ে তোলা এবং নিজের মতের উপর এত অধিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা না থাকা উচিত যা গৃহীত না হলে ক্ষেপে যায়। এই গুণের অপর নামই হল 'সবর'। ইদানীং এ কথাটি সবাই জানে এবং বলেও থাকে যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকার মূল কথা 'সবর' অবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের মত মানাবার ফিকিরে ক্ষেপে না যাওয়ার গুণটি অতি অল্প লোকের মাঝেই পাওয়া যায়। সে কারণেই ঐক্য ও একতার যাবতীয় ওয়াজ-নসীহতই নিষ্ফল হয়ে যায়। অপরকে নিজের কথা বা মত মানাবার ক্ষমতা মানুষের থাকে না। তবে নিজে অপরের কথা বা মতামত মেনে নেবার এবং যদি তাঁর জ্ঞান ও সততার তাগিদে না-ই মানতে পারে, তবে অন্তত মৌনতা অবলম্বন করার অধিকার অবশ্যই তার রয়েছে। কাজেই কোরআন করীম বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য হিদায়ত দানের সঙ্গে সঙ্গে 'সবর' অবলম্বনের দীক্ষাও প্রতিটি ব্যক্তি ও দলকে দিয়েছে যাতে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বেঁচে থাকার কাজটি কার্যক্ষেত্রে সহজ হয়ে যায়।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে কোরআন করীম لَا تَنَازَعُوا বলেছে। অর্থাৎ পারস্পরিক বিবাদ-দ্বন্দ্ব থেকে বিরত করেছে, মতের পার্থক্য কিংবা তা প্রকাশ করতে বাধা দেয়নি। যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সাথে সাথে নিজের মত অন্যকে মানাবার প্রেরণা কার্যকর থাকে তাকেই বলা হয় বিবাদ ও বিসংবাদ। আর এটিই হল সে প্রেরণা যাকে কোরআন করীম— وَاصْبِرُوا শব্দে ব্যক্ত করেছে এবং সবশেষে সবর অবলম্বনের এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিক্ততাকে দূর করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ অর্থাৎ যারা সবর অবলম্বন করে তথা

ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে রয়েছেন। এটি এমন এক মহা সম্পদ যে, ইহা পরকালের যাবতীয় সম্পদের মুকাবিলায় অতি নগণ্য।

কোন কোন যুদ্ধে স্বয়ং রসূলে করীম (সা) এ সমস্ত হিদায়তকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই ভাষণ দান করেছেন—"হে উপস্থিত সৈন্যগণ, তোমরা শত্রুর মুকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করো না বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অব্যাহতি কামনা কর। আর অগত্যা যদি মুকাবিলা হয়েই যায়, তবে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবশ্যই অবলম্বন কর এবং একথা জেনে নাও যে, জান্নাত তলোয়ারের ছায়াতেই নিহিত।—(মুসলিম)

৪৭তম আয়াতে আরো একটি ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্কীকরণ এবং তা থেকে বাঁচার হিদায়ত দান করা হয়েছে। তা হল নিজের শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের উপর গর্ব করা কিংবা কাজ করতে গিয়ে সত্যতা ও নিঃস্বার্থতার পরিবর্তে নিজের অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকানো থাকা। কারণ, এ দুটি বিষয়ও বড় বড় শক্তিশালী দলকে পর্যন্ত পরাস্ত-পরাভূত করে দেয়।

এ আয়াতে মক্কার কুরাইশদের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা নিজেদের বাণিজ্যিক কাফেলার হিফাযতের জন্য বিপুল সংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে নিজেদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে সদম্ভে মক্কা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আর বাণিজ্যিক কাফেলাটি যখন মুসলমানদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখনও তারা ফিরে না গিয়ে নিজেদের সাহস ও বাহাদুরী প্রকাশ করতে চায়।

প্রামাণ্য রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, আবূ সুফিয়ান যখন তার বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে মুসলমানদের নাগালের বাইরে চলে যায় তখন আবূ জাহ্লের কাছে দূত পাঠিয়ে দেয় যে, এখন আর তোমাদের এগিয়ে যাবার দরকার নেই, ফিরে চলে এসো। আবূ সুফিয়ান ছাড়া আরো বহু কুরাইশের মতও ছিল তাই। কিন্তু আবূ জাহ্ল তার গর্ব-অহঙ্কার-দাম্ভিকতা ও খ্যাতির মোহে শপথ করে বসে যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে যাব না, বদরে পৌঁছে যতক্ষণ না কয়েক দিন যাবত নিজেদের বিজয়-উৎসব উদ্‌যাপন করে নেব।

যার পরিণতিতে সে নিজে এবং তার কয়েকজন বড় বড় সাথী সেখানেই নিহত হয় এবং একই গর্তে প্রোথিত হয়ে রয়ে যায়। এ আয়াতে মুসলমানদের তাদের অনুসৃত পন্থা থেকে বিরত থাকারও হিদায়ত দেয়া হয়েছে।

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ
مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى
عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّيٓ

اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ
وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ
عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٩﴾

(৪৮) আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতপর যখন সামনাসামনি হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নেই--- আমি দেখছি যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহ্‌কে। আর আল্লাহ্‌র আযাব অত্যন্ত কঠিন। (৪৯) যখন মুনাফিকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুত, যারা ভরসা করে আল্লাহ্‌র উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ্‌ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদের সাথে সে সময়টির কথা বলুন, যখন শয়তান সে (কাফির) লোক-দেরকে (ওয়াস্‌ওয়াসার মাধ্যমে) তাদের (কুফরীসুলভ) আচরণ [রসূল (সা)-এর বিরোধিতা প্রভৃতিকে তাদের দৃষ্টিতে] সুন্দর করে দেখায় (ফলে তারা এ সমস্ত বিষয়কে ভাল মনে করতে থাকে)। তদুপরি (সে ওয়াস্‌ওয়াসার উর্ধ্বে তাদের সামনাসামনি এ কথাও) বলে যে, (তোমাদের মাঝে এমন শক্তি-সামর্থ্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তোমা-দের বিরোধী) লোকদের মধ্যে আজকের দিনে কেউই তোমাদের উপর বিজয় অর্জন করার মত নেই। আর আমি তোমাদের সমর্থক---(তোমরা বহিরাগত শত্রুদেরও কোন ভয় করো না এবং ভেতরের শত্রুদের ব্যাপারেও কোন রকম আশংকা করো না)। তারপর যখন (কাফির ও মুসলমান) উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সামনাসামনি হয়ে যায় (এবং সে অর্থাৎ শয়তান যখন ফেরেশতাদের অবতরণ প্রত্যক্ষ করে) তখন পিছন ফিরে পলাতে আরম্ভ করে এবং বলে, তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (আমি সমর্থক-সহায়ক কোন কিছুই নই। কারণ,) আমি সে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করছি যা তোমরা দেখতে পাও না (অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী)। আমি যে আল্লাহ্‌কে ভয় করি (যে, তিনি না আবার এ পৃথিবীতেই ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমার খবর নিয়ে নেন)। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন কঠিন শাস্তিদাতা। তাছাড়া সে বিষয়টিও স্মরণ করার মত, যখন (মদীনার মুনাফিকদের মধ্য থেকে) এবং (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যাদের অন্তরে (সন্দেহ সংশয়জনিত) ব্যাধি বিদ্যমান ছিল (নিঃসম্বল মুসলমানদের কাফিরদের মুকাবিলায় আসতে দেখে) বলছিল যে, এসব

(মুসলমান) লোকগুলোকে তাদের ধর্ম এক বিভ্রান্তিতে নিপতিত করে দিয়েছে; (নিজেদের ধর্মের সত্যতার ভরসায় এরা এহেন কঠিন বিপদে এসে পড়ছে।' আল্লাহ্ উত্তর দিচ্ছেন---) আল্লাহ্র উপর যারা ভরসা করে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই হয় বিজয়ী। কারণ,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পরাক্রমশীল। (কাজেই তাঁর উপর ভরসাকারীকে বিজয়ী করে দেন। অবশ্য ঘটনাচক্রে এমন ভরসাকারীও যদি কখনো পরাজিত হয়ে পড়ে, তবে তার পেছনে কিছু মঙ্গল নিহিত থাকে। কারণ,) তিনি সুবিজ্ঞও বটেন। (সুতরাং কোন কিছুই বাহ্যিক সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, প্রকৃত ক্ষমতাশীল হলেন অন্যজন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আন্‌ফালের প্রথম থেকেই চলে আসছে বদর যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাবলী, উপস্থিত পরিস্থিতি, তাতে অর্জিত শিক্ষা ও উপদেশাবলী এবং আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত আলোচনা।

সেসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে শয়তান কর্তৃক মক্কার কুরাইশদের প্রতারিত করে মুসলমানদের মুকাবিলায় নামানো এবং ঠিক যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তার পালিয়ে যাওয়া। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে সেকথাই বলা হয়েছে।

শয়তানের এই প্রতারণা ছিল কুরাইশদের মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টির আকারে কিংবা মানুষের আকৃতিতে সরাসরি সামনে এসে কথাবার্তা বলার মাধ্যমে। এতে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। তবে কোরআনের শব্দাবলীতে দ্বিতীয় প্রকৃতির প্রতিই অধিকতর সমর্থন বোঝা যায় যে, সে মানুষের আকৃতিতে সামনাসামনি এসে প্রতারিত করেছিল।

ইমাম ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশংকা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ বকর গোত্রও আমাদের শত্রু; আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগে এই শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়ি-ঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে! সুতরাং কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশংকা তাদের পায়ের বেড়ি হয়ে রইল। এমনি সময়ে শয়তান সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হল যে, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তার সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সোরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কুরাইশদের মনে তারই আক্রমণের আশংকা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কুরাইশ জওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বসল এবং দু'ভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। প্রথমত, لا غالب لكم اليوم

مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আজকের দিনে এমন কেউ নেই, যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষের সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তিসামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি---কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে, তোমাদের মুকাবিলায় বিজয় অর্জন করবে এমন কেউ নেই।

দ্বিতীয়ত, إِنِّي جَارٌ لَّكُمْ অর্থাৎ বনি বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশংকা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি যে, এমনটি হবে না; আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। মক্কার কুরাইশরা সোরাকা ইবনে মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল, কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে গেল এবং বনি বকর গোত্রের আক্রমণাশংকা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় উদ্বুদ্ধ হল।

এই দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ অর্থাৎ যখন মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের উভয় দল (বদর প্রাঙ্গণে) সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে গেল, তখন শয়তান পেছন ফিরে পালিয়ে গেল।

বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের সহায়তায় একটি শয়তানী বাহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুকাবিলায় হযরত জিব্‌রাঈল ও মীকাঈল (আ)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন মানবাকৃতিতে সোরাকা ইবনে মালিকের রূপে স্বীয় শয়তানী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল তখন সে জিবরাঈল-আমীন এবং তাঁর সাথী ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাতে এক কুরাইশী যুবক হারেছ ইবনে হিশামের হাতে ধরা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ! তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের শয়তানী বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেছ তাকে সোরাকা মনে করে বলল, হে আরব সর্দার সোরাকা, তুমি তো বলেছিলে: "আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি।" অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ। তখন শয়তান সোরাকা বেশেই উত্তর দিল: إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

অর্থাৎ আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি হতে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ, আমি এমন

জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না। অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

শয়তান যখন ফেরেশতা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। তবে তার বাক্য 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি।' সম্পর্কে তফসীর শাস্ত্রের ইমাম কাতাদাহ বলেন যে, কথাটি সে মিথ্যা বলেছিল। সত্যি সত্যিই যদি সে আল্লাহ্‌কে ভয় করত, তাহলে নাফরমানী করবে কেন? কিন্তু অধিকাংশ মনীষী বলেছেন যে, ভয় করাও যথাস্থানে ঠিক। কারণ, সে যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরত তথা মহা ক্ষমতা এবং কঠিন আযাব সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত, কাজেই ভয় না করার কোন কারণ থাকতে পারে না। তবে ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া শুধু ভয় করায় কোন লাভ নেই।

সোরাকা এবং তার বাহিনীর পশ্চাদপসরণের দরুন স্বীয় বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়তে দেখে আবূ জাহ্‌ল কথাটি ঘুরিয়ে বলল, সোরাকা পালিয়ে যাওয়ায় তোমরা ঘাবড়িয়ো না, সে তো মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল। যা-হোক, শয়তানের পশ্চাদপসরণের পর তাদের যা পরিণতি হবার ছিল তা-ই হল। তারপর যখন মক্কায় ফিরে এল এবং সোরাকা ইবনে মালিকের সঙ্গে তাদের একজনের দেখা হল, তখন সে সোরাকার প্রতি ভর্ৎসনা করে বলল, "বদর যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ও যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমারই উপর অর্পিত হবে। তুমি ঠিক যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সমরাঙ্গন থেকে পশ্চাদপসরণ করে আমাদের জওয়ানদের মনোবল ভেঙে দিয়েছ।" সে বলল, "আমি তো তোমাদের সাথেও যাইনি, তোমাদের কোন কাজেও অংশগ্রহণ করিনি। তোমাদের পরাজয়ের সংবাদও তো আমি তোমাদের মক্কায় ফিরে আসার পরেই শুনেছি।"

এসব রেওয়ায়েত ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, অভিশপ্ত শয়তানের এটি একটি সাধারণ অভ্যাস যে, সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে দিয়ে ঠিক সময় মত আলাদা হয়ে যায়। তার এ অভ্যাস সম্পর্কে কোরআনে করীমও বার বার আলোচনা করেছে। এক আয়াতে রয়েছে ঃ— كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

শয়তানের ধোঁকা প্রতারণা এবং তা থেকে বাঁচার উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে ঃ

(১) শয়তান মানুষের জাতশত্রু, তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সে নানা রকম কলা-কৌশল ও চাল-ছলনার আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন রূপ বদলাতে থাকে। কোন কোন

সময় শুধু মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে পেরেশান করে তোলে, আবার কখনো সামনাসামনি এসে ধোঁকা দেয়।

(২) শয়তানকে আল্লাহ্ তা'আলা এই ক্ষমতা দান করেছেন যে, সে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনৈক প্রখ্যাত হানাফী ফিকাহ্‌বিদের গ্রন্থ 'আকামুল-মার্জান ফী আহকামিল্ জানান'-এ বিষয়টি সবিস্তারে প্রমাণ করা হয়েছে। সে কারণেই গবেষক সূফী মনীষীবৃন্দ যাঁরা আধ্যাত্মিক কাশ্‌ফ ও দর্শনের ক্ষমতা রাখেন তাঁরা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোন লোককে দেখেই কিংবা তার কথাবার্তা শুনেই কোন রকম অনুসন্ধান না করে তার পেছনে চলতে আরম্ভ করা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে এমন কি কাশ্‌ফ ও ইলহামেও শয়তানের পক্ষ থেকে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং মাওলানা রুমী (র) বলেনঃ

اے بسا ابلیس آدم روئے ست
پس بهر دستے نشاید داد دشت

আর হাফেয বলেনঃ

دور راه عشق وسوسه اهرمن بسے ست
هشدار وگوش را بـه پیام سروش دار

'পায়ামে সরোশ' অর্থ আল্লাহ্‌র ওহী।

কৃতকার্যতার জন্য নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, পথের সরলতাও অপরিহার্যঃ (৩) যেসব লোক কুফর ও শিরক কিংবা অন্য কোন অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসাবে প্রকাশ করে তাদের মন-মস্তিষ্ককে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত পরিণতি থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকেই ভাল মনে করতে শুরু করে দেয়। ন্যায়পন্থীদের মত তারাও নিজেদের অন্যায় অসত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরি হয়ে যায়। সেজন্য কুরাইশ বাহিনী এবং তার সর্দার যখন বায়তুল্লাহ্ থেকে বিদায় নিচ্ছিল, তখন বায়তুল্লাহ্‌র সামনে এসব শব্দে প্রার্থনা করে বলেছিলঃ **اللهم انصر اهدى الطائفتين** —অর্থাৎ "আয় আল্লাহ্ উভয় দলের যেটি অধিকতর সৎপন্থী তারই সাহায্য কর, তাকেই বিজয় দান কর।" এই অজ্ঞ লোকেরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হিদায়ত প্রাপ্ত এবং ন্যায়পন্থী বলে মনে করত। আর পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে নিজেদের মিথ্যা ও অন্যায়ের সাহায্য ও সমর্থনে জানমাল কোরবান করে দিত।

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল তথা কার্যকলাপের গতি-প্রকৃতি সঠিক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়।

অতপর দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে মদীনার মুনাফিক ও মক্কার মুশরিকদের একটি যৌথ সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে যা তাদের জন্য দুঃখ করেই যেন বলা হয়েছিল। তা হচ্ছে এই ঃ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ — অর্থাৎ বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা যে এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে চলে এসেছে, তা এই বেচারাদের তাদের দীনই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে ফেলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেছেন ঃ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে নেয়, জেনে রাখো, সে কখনও অপমানিত-অপদস্থ হয় না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর পরাক্রমশীল। তাঁর কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান-বুদ্ধিই বিকল হয়ে যায়। মমার্থ এই যে, তোমরা শুধু বস্তু ও বস্তুজগত সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তোমাদের কোন খবরই নেই যা বস্তু ও বস্তুজগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার ভাণ্ডারে রয়েছে এবং যা তাঁর উপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের সঙ্গে থাকে।

ইদানীংকালেও সরল-সোজা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখে তথাকথিত অনেক বিজ্ঞ-বুদ্ধিমান বলে থাকে—"এরা পুরান দিনের লোক, এদের কিছু বলো না।" কিন্তু এদের মধ্যে যদি আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও ভরসা থাকে, তবে এতে তাদের কিছুই অনিষ্ট হতে পারে না।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ
يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٥٠
ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝٥١
كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٥٢ ذٰلِكَ
بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰي قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا
مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٥٣

---

(৫০) আর যদি তুমি দেখ, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের জান কবজ করে; প্রহার করে তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদ্দেশে আর বলে, জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ

গ্রহণ কর। (৫১) এই হলো সে সবের বিনিময় যা তোমরা তোমাদের পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে। বস্তুত এটি এ জন্য যে, আল্লাহ্ বান্দার উপর জুলুম করেন না। (৫২) যেমন, রীতি রয়েছে ফিরাউনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের ব্যাপারে যে, এরা আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাকড়াও করেছেন তাদেরই পাপের দরুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহা শক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা। (৫৩) তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ কখনও পরিবর্তন করেন না সে সব নিয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুত আল্লাহ্ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি যদি (তখনকার ঘটনা) প্রত্যক্ষ করেন (তবে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখবেন—) যখন ফেরেশতারা এই (বর্তমান) কাফিরদের জান কবজ করে যাচ্ছেন (এবং) তাদের মুখে-পিঠে প্রহার করেছেন এবং একথা বলছেন যে (এখনই কি দেখেছ পরবর্তিতে) আগুনের শাস্তি ভোগ করবে (আর) এ আযাব সে সব (কুফরী) কৃতকর্মেরই কারণে যা তোমরা নিজের হাতে সংগ্রহ করেছ। তাছাড়া একথা সপ্রমাণিত যে, আল্লাহ্ বান্দাদের উপর জুলুমকারী নন। (সুতরাং আল্লাহ্ বিনা অপরাধে শাস্তি দেননি। অতএব কুফরের কারণে শাস্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে) তাদের অবস্থা তেমনি যেমন ফিরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী (কাফির)-দের অবস্থা ছিল তারাও আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং তার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (সে) পাপের দরুন তাদের (আযাবের মাঝে) পাকড়াও করেছিলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মহা শক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা। (তাঁর মুকাবিলায় এমন কোন শক্তি নেই যে তাঁর আযাবকে প্রতিহত করতে পারে। আর 'বিনা অপরাধে আমি যে শাস্তি দান করি না'—) তা এ কারণে যে, (আমার একটি মূলনীতি নির্ধারিত রয়েছে। আর বিনা অপরাধে শাস্তি না দেওয়া তারই একটি ধারা। বস্তুত সে নিয়মটি হল এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নিয়ামতকে পরিবর্তন করেন না যা কোন জাতিকে দান করেছেন, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের নিজস্ব কার্যকলাপ পরিবর্তন করে দেয়। আর এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত শ্রবনশীল, মহাজ্ঞানী। (সুতরাং তিনি কথার পরিবর্তনকে শোনেন, কাজের পরিবর্তন সম্পর্কে জানেন। বস্তুত উপস্থিত কাফিররা তাদের অবস্থার এই পরিবর্তন সাধন করে যে, তাদের মাঝে কুফরী থাকা সত্ত্বেও প্রথমে ঈমান আনার যোগ্যতা নিকটবর্তী ছিল, কিন্তু অস্বীকৃতি ও বিরোধিতা করে করে সে যোগ্যতাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কাজেই আমি তাদের প্রতি 'অবকাশ' দানের যে নিয়ামত দিয়ে রেখেছিলাম, তা পাকড়াও জনিত আযাবে পরিবর্তিত করে

দিয়েছি। কারণ, তারা উল্লিখিত পন্থায় নিকটবর্তী নিয়ামত হিদায়েত প্রাপ্তির যোগ্যতাকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু'আয়াতে কাফিরদের মৃত্যুকালীন আযাব এবং ফেরেশতাদের সতর্কীকরণের আলোচনা করা হয়েছে। এতে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা কাফিরদের রূহ কবজ করেন এবং তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করেন এবং বলেন যে, আগুনে জ্বলার আযাবের মজা গ্রহণ কর ; আপনি যদি সে সময়ে তাদের অবস্থা দেখতেন, তখন আপনি এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমামদের কেউ কেউ এ বিবরণকে সে সমস্ত কোরাইশ কাফিরের অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে এই যে, বদর যুদ্ধে যে সব কাফির সর্দার নিহত হয় তাদের মৃত্যুতে ফেরেশতাদের হাত ছিল। তাঁরা তাদেরকে সামনের দিক দিয়ে তাদের মুখে এবং পেছন দিক থেকে তাদের পিঠে আঘাত করে তাদের হত্যা করেছিলেন আর সেই সঙ্গে আখিরাতের জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে তাদের সংবাদ দিয়ে দিচ্ছিলেন।

আর যারা আয়াতের শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এর বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যখন কোন কাফির মৃত্যুবরণ করে, তখন মওতের ফেরেশতা রূহ কবজ করার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাঁদের হাতে আগুনের চাবুক এবং লোহার গদা থাকে যার দ্বারা মরণোন্মুখ কাফিরকে আঘাত করা হয়। কিন্তু যেহেতু এই আযাবের সম্পর্ক জড়জগতের সাথে নয়, বরং কবর জগতের সাথে যাকে 'বরযখ' বলা হয় কাজেই এই আযাব সাধারণত চোখে দেখা যায় না।

সেজন্যই রসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "যদি আপনি দেখতেন, তবে বড়ই করুণ দৃশ্য দেখতে পেতেন।" এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখেও অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কাফিরদের উপর আযাব হয়ে থাকে। কিন্তু এর সম্পর্ক হল আলমে গায়েব বা অদৃশ্য জগতের সাথে। তাই তা সাধারণভাবে দেখা যায় না। কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বর্ণনাতেও কবর আযাবের ব্যাপারে বিপুল আলোচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফিরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখিরাতে এ আযাব তোমাদের নিজের হাতেরই অর্জিত। সাধারণ কাজকর্ম যেহেতু হাতের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেহেতু এখানেও হাতেরই উল্লেখ করা হয়েছে। মর্মার্থ হল এই যে, এসব আযাব তোমাদের নিজেদের আমলেরই ফলাফল। আর একথা সত্য যে, আল্লাহ্

তাঁর বান্দার উপর জুলুমকারী নন যে, অকারণেই কাউকে আযাবে নিপতিত করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার এই আযাব নতুন কিছু নয়, বরং এটাই আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ রীতি যে, তিনি তাঁর বান্দাদের হিদায়েতের জন্য তাদেরকে জ্ঞানবুদ্ধি দান করেন, আশেপাশে তাদের জন্য এমন অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান থাকে যেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেই তারা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরত ও মহত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং অসহায় সৃষ্টিকে আর তাঁর সাথে শরীক করে না। তদুপরি অতিরিক্ত সতর্কীকরণের জন্য নবী-রসূল পাঠান। আল্লাহ্‌র রসূল তাদের বুঝতে ও বোঝাতে সামান্যতম ত্রুটিও রাখেন না। তাঁরা তাদেরকে মু'জিযা আকারে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ানক ক্ষমতার দৃশ্যাবলীও দেখান। তারপরেও যখন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এ সমস্ত বিষয় থেকে চোখ বন্ধ করে নেয় এবং আল্লাহ্‌র সতর্কতার কোনটিতেই কান দেয় না, তখন এহেন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হল এই যে, পৃথিবীতেও তাদের উপর আযাব নেমে আসে এবং আখিরাতেও অন্তহীন আযাবে বন্দী হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে : كَدَأْبِ

آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ রীতি, অভ্যাস। অর্থাৎ ফিরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী কাফির ও উদ্ধত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি সম্পর্কে গোটা বিশ্বই জানতে পেরেছে যে, তিনি ফিরাউনকে তার সমস্ত আড়ম্বর ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং তার পূর্ববর্তী আ'দ ও সামূদ জাতি-সমূহকে বিভিন্ন প্রকৃতির আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় আযাবে নিপতিত করেছেন। اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আল্লাহ্ অত্যন্ত শক্তিশালী, কোন ক্ষমতাবানই নিজের শক্তির বলে তাঁর আযাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতিকে যে নিয়ামত দান করেন তিনি তা ততক্ষণ

পর্যন্ত বদলান না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজেই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপ বদলে দেয়।

এখানে প্রথম এ কথাটি লক্ষণীয় যে, আল্লাহ নিয়ামত দান করার জন্য কোন মূলনীতি বর্ণনা করেন নি। না সে জন্য কোন রকম বাধ্যবাধকতা ও শর্তাশর্ত আরোপ করেছেন, না তা কারো কোন সৎকর্মের উপর তা নির্ভরশীল রেখেছেন। তার কারণ যদি এমনই হতো, তবে সর্বপ্রথম নিয়ামত আমাদের অস্তিত্ব যাতে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর আশ্চর্যজনক শিল্পকর্মের হাজারো বিস্ময়কর নিয়ামতের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এসব নিয়ামত সে সময় দান করা হয়, যখন না ছিলাম আমরা, না ছিল আমাদের কোন আমল বা কাজকর্ম।

ما نبود یم و تقاضا ما نبود
لطف تو نا گفتۂ ما می شنود

কাজেই যদি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ বান্দার সৎকর্মের অপেক্ষায় থাকত, তবে আমাদের অস্তিত্বই স্থাপিত হতো না।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও রহমত তথা তাঁর দান ও করুণা তাঁর রব্বুল আলামীন ও রাহমানুররাহীম গুণেরই প্রকৃতিগত ফসল। তবে অবশ্য এ সমস্ত নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য একটা নিয়ম বা মূলনীতি রয়েছে যা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, যে জাতিকে আল্লাহ তা'আলা কোন নিয়ামত দান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপকে পরিবর্তিত করে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়।

অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে ভাল ও সৎ অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তে মন্দ অবস্থা ও কার্যকলাপ অবলম্বন করে নেওয়া কিংবা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত আগমনের সময় যে সমস্ত মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল নিয়ামত প্রাপ্তির পর তারচেয়ে অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া।

এই বিশ্লেষণের দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, বিগত আয়াতগুলোতে যে সমস্ত জাতি-সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ কোরাইশ গোত্রের কাফিররা এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়; এ আয়াতের সাথে তাদের সম্পর্ক এ কারণে যে, এরা যদিও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত প্রাপ্তির সময়ও তেমন কোন ভাল অবস্থায় ছিল না; সবাই ছিল মুশরিক ও কাফির, কিন্তু নিয়ামত প্রাপ্তির পর এরা নিজেদের মন্দাচার ও অসৎ কর্মে পূর্বের চাইতে বহুগুণে বেশি তৎপর হয়ে ওঠে।

ফিরাউনের বংশধররা বনী ইসরাঈলদের উপর নানা রকম অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং হযরত মূসা (আ)-এর মুকাবিলা ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। যা ছিল তাদের পূর্ববর্তী অপরাধে আরেকটি সংযোজন। এতে করে তারা নিজেদের

অবস্থাকে অধিকতর কল্যাণের দিকে প্রত্যাবর্তিত করে দেয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর নিয়ামতকে বিপদাপদ ও শাস্তি-সাজায় বদলে দেন। তেমনিভাবে মক্কার কোরাইশরা যদিও মুশরিক ও বদকার ছিল, কিন্তু তার সাথে সাথে তাদের মাঝে কিছু সৎকর্ম, সেলাহ্-রেহমী, স্বজনবাৎসল্য, মেহমান-নাওয়াযী তথা অতিথিপরায়ণতা, হাজীদের সেবা, বায়তুল্লাহ্‌র প্রতি সম্মানবোধ প্রভৃতি কিছু সদগুণও বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য দীন দুনিয়ায় নিয়ামতরাজির দরজা খুলে দিয়েছেন; দুনিয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি দান করেছেন। যেসব দেশে কারো বাণিজ্যিক কাফেলা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারত না সেসব দেশে—যেমন, সিরিয়া ও ইয়ামেনে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা যেত এবং একান্ত নিরাপদে লাভবান হয়ে ফিরে আসত। তার আলোচনা করেছে কোরআনে করীম لإيلف সূরায় رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ শিরোনামে।

আর দীনের দিক দিয়ে সে মহা নিয়ামত তাদের দান করা হয়েছে যা বিগত কোন জাতি-সম্প্রদায়ই পায়নি। তাদেরই মাঝে আবির্ভূত হন নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ নবী (সা) এবং তাদেরই মাঝে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ কোর-আন করীম।

কিন্তু এরা আল্লাহ্ তা'আলার এ সমস্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করা, এর যথার্থ মর্যাদা দান এবং এগুলোর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করার পরিবর্তে আগের চেয়েও বেশি পঙ্কিলতায় মজে যায়। সেলাহ-রেহমী পরিহার করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার অপরাধে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর চরম বর্বরতাসুলভ উৎপীড়ন চালাতে আরম্ভ করে, অতিথিপরায়ণতার পরিবর্তে সেই মুসলমানদের জন্য দানাপানি বন্ধ করার প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করে, হাজীদের সেবা করার পরিবর্তে মুসলমানদের হেরেমে প্রবেশে পর্যন্ত বাধা দান করতে থাকে। এগুলো ছিল সেসব অবস্থা যাকে কোরাইশ কাফিররা পরিবর্তন করে ফেলেছিল। এরই পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামত-সমূহকে বিপদাপদ ও আযাবে রূপান্তরিত করে দেন। ফলে এরা দুনিয়াতেও অপদস্থ হয় এবং যে সত্তা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য রাহ্‌মাতুল্‌লিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন তাঁরই মাধ্যমে এরা নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানায়।

তফসীরে মাযহারীতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিলাব ইবনে মুররা যিনি রসূলে করীম (সা)-এর বংশ পরম্পরায় তৃতীয় পুরুষে পরদাদা হিসাবে গণ্য তিনি প্রথম থেকেই দীনে-ইবরাহীমী ও ইসমাঈলীর অনুগামী ছিলেন এবং বংশানুক্রমিকভাবে এ দীনের নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্য তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। কোসাই ইবনে কিলাবের সময়ে তাদের মধ্যে মূর্তি উপাসনার সূচনা হয়। তাঁর পূর্বে তাদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন কা'আব ইবনে লুওয়াই। তিনি জুমার দিন যাকে তাদের ভাষায় 'আরোয়িয়া' বলা হত (সমাজের) সবাইকে সমবেত করে ভাষণ